বাংলা কবিতার উদ্ভব ও বিকাশ : একটি রূপরেখা

নানা বিতর্ক ও ভিন্নমত থাকলেও, একথা আজ সকলেই মেনে নিয়েছেন যে বাংলা সাহিত্যের বয়স আনুমানিক এক হাজার বছর। পৃথিবীর সব সাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্যেরও যাত্রা শুরু কবিতা দিয়ে। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ। আনুমানিক এক হাজার বছর পূর্বে এগুলো রচিত হয়েছে বলে পন্ডিতেরা মনে করেন। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের রচিত এ পদগুলো দীর্ঘদিন অনাবিষ্কৃত ছিল। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এগুলো নেপাল রাজদরবারের পুঁথিশালা থেকে উদ্ধার করেন। চর্যাপদে প্রাচীন বাংলার সমাজ জীবনের নানা ছবি চিত্রিত হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বকথা অবলম্বনে রচিত হলেও, চর্যাপদগুলো সাহিত্যগুণেও অনন্য। চর্যাপদের প্রধান কবিরা হলেন লুইপাদ, ভুসুকুপাদ, কাহ্নপাদ, সরহপাদ, শান্তিপাদ ও শরপাদ। চর্যাপদ ছাড়া প্রাচীন যুগের (৬৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দকে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ বলা হয়) আর কোন সাহিত্য নিদর্শন এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয়নি।

চর্যাপদের পর বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম হচ্ছে বড়ু চন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য'। আনুমানিক ত্রয়োদশ শতাব্দীর দিকে এ কাব্য রচিত হয়েছে বলে পন্ডিতেরা মত প্রকাশ করেছেন। তবে চর্যাপদের মতোই এ কাব্যও রচনার বহু শতাব্দী পরে আবিষ্কৃত হয়। ১৯০৯ সালে বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রাম থেকে কাব্যের পুঁথিটি উদ্ধার করেন বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ। এটি রাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক আখ্যানকাব্য। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের (১২০১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্তসময়কে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ বলা হয়) প্রথম নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

মধ্যযুগের বাংলা কবিতা প্রধানত চারটি শাখায় বিকাশ লাভ করে। এ শাখা চারটি হলো বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গলকাব্য, রোমান্সমূলক প্রণয়-কাব্য এবং অনুবাদ-কাব্য। চর্যাপদ এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের মতো এ-সব সাহিত্যশাখাও ধর্মচিন্তাকে কেন্দ্র করে বিকাশ লাভ করে। বৈষ্ণব ধর্মমতকে অবলম্বন করে রচিত হয় বৈষ্ণব পদাবলী। চৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) মানবতাবাদী ধর্মচিন্তা বৈষ্ণব সাহিত্যসৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ প্রেরণা সঞ্চার করে। সাহিত্যগুণে বৈষ্ণব পদাবলী বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ। রাধা-কৃষ্ণের মর্ত্যলীলাকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে বৈষ্ণব পদাবলী। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রধান কবিরা হচ্ছে ন- বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস ও বলরামদাস।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শাখা হচ্ছে মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্য রচনার পশ্চাতেও ধর্মীয় প্রেরণা কাজ করেছে। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্তসময়কালে রচিত হয় মঙ্গলকাব্য। বিভিন্ন দেব-দেবীর ার জা প্রচার সম্পর্কিত এক প্রকার আখ্যানকাব্যকে মঙ্গলকাব্য বলে। মধ্যযুগের মানুষ জাগতিক নানা প্রয়োজনে ও বিপদে-আপদে এ-সব দেব-দেবীর শরণাপন্ন হয়েছে। এভাবে হিংস্র শ্বাপদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য চন্ডীদেবীর পরিকল্পনা, সাপের হাত থেকে বাঁচার জন্য মনসাদেবীর অধিষ্ঠান, বসন্তরোগের হাত থেকে বাঁচার জন্য শীতলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এরূপে আরও বহু দেব-দেবীর পরিকল্পনা করা হয়েছে। নানা দেব-দেবীর পরিকল্পনার কারণে মঙ্গলকাব্যেও রয়েছে নানা শাখা। মনসামঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, শিবমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, প্রভৃতি হচ্ছে মঙ্গলকাব্যের প্রধান প্রধান শাখা। মনসামঙ্গলের প্রধান কবিরা হচ্ছেন বিজয় গুপ্ত, নারায়ন দেব, বিপ্রদাস প্রমুখ। চন্ডীমঙ্গলের প্রধান কবি হচ্ছেন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, যিনি কবিকঙ্কন নামে সমধিক পরিচিত। অন্নদামঙ্গলের প্রধান কবির নাম ভারতচন্দ্র রায়। মঙ্গলকাব্যসমূ হ ধর্মীয় প্রেরণার রচিত হলেও এ-সব কাব্য মধ্যযুগের বাংলাদেশের সমাজ ও সভ্যতার নানা দিক বিধৃত হয়ে আছে। সাহিত্যগুণেও এ-কাব্য বিশিষ্টতার পরিচয়বাহী। ধর্মীয় প্রেরণায় রচিত মধ্যযুগের সাহিত্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য শাখা হচ্ছে অনুবাদ কাব্য। সংস্কৃত রামায়ণ মহাভারত ভাগবতের অনুবাদের মাধ্যমে এ কাব্যশাখার সৃষ্টি। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্তঅনুবাদকাব্য বিশেষ বিকাশ লাভ করে। রামায়ণ-মহাভারত ভাগবতের অনুবাদের মাধ্যমে নতুন জীবনাদর্শে সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন অনুবাদকরা। বাল্মীকির মূল রামায়ণ প্রথম বাংলায় অনুবাদ করেন কৃত্তিবাস ওঝা। পঞ্চদশ শতাব্দীতে তিনি রামায়ণ অনুবাদ করেন। মহাভারতের প্রথম বঙ্গানুবাদক হচ্ছেন কাশীরাম দাস। আরও অনেক কবি রামায়ণ ও মহাভারত অনুবাদ করে বাংলা অনুবাদ কাব্যের শাখাটি সমৃদ্ধ করেছেন।

মধ্যযুগে এ পর্যন্তযে-সব সাহিত্যশাখার কথা আমরা জেনেছি, তার সবগুলোই হিন্দু ধর্মের বিষয় ও বিধানকে অবলম্বন করে রচিত। ইসলাম ধর্মের প্রসার ও প্রচারকল্পে সুফী ধর্মমতের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় এ-সময় মুসলিম কবিদের হাতে নতুন এক কাব্যশাখার সৃষ্টি হয়। সাহিত্যের ইতিহাসে এ কাব্যশাখা রোমান্সমূ লক প্রণয়-কাব্য নামে পরিচিত। এগুলো মূলত আখ্যান কাব্য। বাংলা রোমান্সমূ লক প্রণয়-কাব্যের ধারায় যাঁদের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়, তাঁরা হচ্ছে ন সৈয়দ সুলতান, সৈয়দ আলাওল, মুহম্মদ কবীর, কাজী দৌলত, দৌলত উজির বাহরাম খান প্রমুখ। এঁদের মধ্যে সৈয়দ আলাওলের অবদান খুবই উল্লেখযোগ্য। পদ্মাবতী, হপ্তপয়কর প্রভৃতি আলাওলের উল্লেখযোগ্য কাব্য। রোমান্সমূ লক প্রণয়কাব্যসমূহ ধর্মীয় প্রেরণায় সৃষ্টি হলেও, এগুলোর মধ্যেও মধ্যযুগের বাংলাদেশের বহুমাত্রিক সামাজিক পরিচয় পাওয়া যায়।

১৮০১ খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্তসময়কালকে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। আধুনিক যুগে এসে বাংলা সাহিত্য কেবল কবিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি বহু বিচিত্র শাখায় বিচিত্র ভাবে তা বিকাশ লাভ করে। তবে এখানে আমরা কেবল কবিতা সম্পর্কেই জানার চেষ্টা করবো। আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রথম কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)। তবে তাঁরার র্বে মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণে বাংলা কাব্যে আবির্ভূত হন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)। এজন্য তাঁকে 'যুগ-সন্ধিক্ষণের' কবি বলা হয়। তিনি খণ্ড কবিতা রচনা করেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্তই বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক কবি। তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্রষ্টা হিসেবে সমধিক পরিচিত। তাঁর অমর কীর্তি 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১)। এটিই বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহাকাব্য। তিনি পত্রকাব্য এবং সনেটেরও প্রবর্তক। 'বীরাঙ্গনা কাব্য', ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী প্রভৃতি মাইকেল মধুসূদন দত্তের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ রচনা।

মধুসূদন যেমন মহাকাব্য, পত্রকাব্য এবং সনেটের প্রবর্তক, বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪) তেমনি গীতি কবিতার প্রবর্তক। তার 'সঙ্গীত শতক-ই (১৮৬২) হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের প্রথম গীতিকবিতার সঙ্কলন। গীতিকবিতার প্রবর্তন করেছেন বলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'ভোরের পাখি' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। বিহারীলালের অন্যান্য কাব্যের নাম বঙ্গ-সুন্দরী, নিসর্গ সন্দর্শন, বন্ধু বিয়োগ, সাধের আসন, সারদামঙ্গল ইত্যাদি।

এ পর্বেই বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) উজ্জ্বল আবির্ভাব। রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা কাব্য নতুন নতুন মাত্রায় অভিষিক্ত হলো। দুই শতাব্দী জুড়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনা বিস্তৃত। ১৯৭৬ সালে মাত্র পনের বছর বয়সে তাঁর প্রথম কাব্য 'বনফুল' প্রকাশিত হয়। তাঁর সর্বশেষ কাব্য 'শেষলেখা' প্রকাশিত হয় ১৯৪১ সালে। মাঝখানে রয়েছে পঞ্চাশের অধিক কাব্যগ্রন্থ। এ-সব কাব্যের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মানসী, সোনারতরী, চিত্রা, কল্পনা, ক্ষণিকা, গীতাঞ্জলি, বলাকা, পুনশ্চ, পত্রার ট, জন্মদিনে প্রভৃতি। ১৯১৩ সালে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ বিষয় ও প্রকরণে বাংলা কবিতার মান বহুগুণে সমৃদ্ধ করেন। মানবতাবাদী চিন্তায় রবীন্দ্রনাথের শেষপর্বের কবিতা বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ। প্রাত্যহিক জীবনের ভাষা, নিয়ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, নতুন-নতুন ছন্দোরীতি, বিস্ময়কর সংক্ষিপ্তরূপ, অলঙ্কারের স্বল্পতা এবং ভাবসংগতিতে শেষ পর্বের রবীন্দ্রকবিতা বিশিষ্ট ও উজ্জ্বল।

রবীন্দ্রনাথের সমকালে কবিতা লিখে খ্যাতি অর্জন করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২) করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫), যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৭-১৯৪৮), কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮৩-১৯৭০), কালিদাস রায় (১৮৮৯-১৯৭৫) প্রমুখ। কিছু স্বাতন্ত্র্য থাকলেও, এঁরা মূলত রবীন্দ্রনাথের কাব্যচিন্তাতেই লালিত-পালিত ও বর্ধিত। তাই এঁদেরকে রবীন্দ্র-বলয়ের কবি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

এ কালের অন্য তিনজন কবি রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করে প্রকাশের একটা স্বতন্ত্র পথ খোঁজার চেষ্টা করেছেন। এ কবিত্রয় হচ্ছেন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪), মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)। কবিতার বিষয় এবং আঙ্গিকে এঁরা রবীন্দ্রনাথের দূরবর্তী জগতের মানুষ।

উনবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম কবি হিসেবে কায়কোবাদের (১৮৫৭-১৯৫১) অবদানও এখানে স্মরণীয়। 'মহাশ্মশান' কাব্য রচনা করে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর অন্যান্য কাব্য হচ্ছে 'অশ্রুমালা', 'অমিয়ধারা' প্রভৃতি। অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী চেতনা কায়কোবাদের কবি প্রতিভার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বিংশ শতাব্দীর বিশ দশকের সর্বাপেক্ষা প্রবল-প্রাণ কবির নাম কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। বাংলা কবিতার ইতিহাসে তিনি বিদ্রোহী কবি হিসেবে সমধিক পরিচিত। নজরুল ইসলাম মূলত রোমান্টিক কবি। রোমান্টিকতার অন্তর-প্রেরণায় তিনি কখনো উচ্চারণ করেছেন বিদ্রোহের বাণী, কখনো বা গেয়েছেন প্রেম সৌন্দর্যের গান। শব্দব্যবহার ও অলঙ্কার নির্মাণেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর প্রধান প্রধান কাব্যের নাম অগ্নিবীণা, সাম্যবাদী, ভাঙার গান, দোলন চাঁপা, পুবের হাওয়া, চক্রবাক, সিন্ধু-হিন্দোল, মরুভাস্কর ইত্যাদি।

এ পর্বের একজন উল্লেখযোগ্য কবি জসীমউদ্‌দীন (১৯০৩-১৯৭৬)। পল্লী বাংলার জীবন ও বিশ্বাসকে অবলম্বন করে বাংলা কবিতায় তিনি সম্পূর্ণ নতুন একটি ধারা নির্মাণ করেছেন। রাখালী, নক্‌শী কাঁথার মাঠ, সোজন বাদিয়ার ঘাট প্রভৃতি জসীমউদ্‌দীনের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে এসে বাংলা কবিতায় নতুন পরিবর্তন সূচিত হলো। জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০), অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৯৩), অজিত দত্ত (১৯০৭-১৯৭৯), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২) প্রমুখ এ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি। এঁরা তিরিশোত্তর কবি হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন। এঁদের কবিতার প্রধান প্রবণতা আধুনিক জীবনের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা অবিশ্বাস রূপায়ণ ও রবীন্দ্র-বিরোধিতা। তিরিশোত্তর এ কবি সমাজের হাতে বাংলা কবিতা বিষয় ও আঙ্গিকে নতুন মাত্রা অর্জন করে।

চল্লিশের দশকে বাংলা কবিতায় সমাজমনস্কতার ছায়াপাত ঘটে। পুঁজিবাদ বিরোধিতা, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা এবং সমাজতান্ত্রিক চিন্তার প্রকাশ এ-পর্বের কবিতার প্রধান লক্ষণ। এ দশকের প্রধান কবিরা হলেন, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্তভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র, দিনেশ দাশ, কিরুণশঙ্কর সেনগুপ্ত, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির ফলে বাংলা কবিতা দুটি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। পূর্ব বাংলা কেন্দ্রিক কবিরা বাংলা কবিতার একটি স্বতন্ত্র ধারা নির্মাণে সচেষ্ট হলেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এ ধারার কবিদের মধ্যে প্রবল প্রতিবাদী চেতনা সৃষ্টি করে। এ ধারার কবিদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেযোগ্যা হলেন আবুল হোসেন, আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, সৈয়দ আলী আহসান, সিকান্দার আবু জাফর, আবদুল গণি হাজারী, সানাউল হক, সৈয়দ শামসুল হক, আলাউদ্দিন আল-আজাদ, শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, আল মাহমুদ, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান প্রমুখ। ষাটের দশকের পর থেকে বর্তমান কাল পর্যন্তআরও অনেক কবি পূর্ববালা তথা বাংলাদেশ কেন্দ্রিক কাব্যধারা বিকাশে গুরুত্বার র্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

১৯৪৭ পরবর্তীকালে পশ্চিমবাংলার কবিতাও স্বতন্ত্র পথে বিকাশ লাভ করে। এ-পর্বে পশ্চিমবাংলার প্রধান কবিরা হচ্ছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সিদ্ধেশ্বর সেন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায, শঙ্খ ঘোষ প্রমুখ। অনেক নবীন কবি সম্মিলিত সাধনায় পশ্চিম বাংলার কবিতা বিকাশে এখন গুরুত্বারপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

হাজার বছরের বাংলা কবিতার ইতিহাস আমরা সংক্ষেপে ওপরের আলোচনায় তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। এ আলোচনা পাঠ করে আপনি কবিতা অধ্যয়ন করার চেষ্টা করুন, তাহলে পাঠ অনুধাবন আপনার জন্য সহজ হবে।

গদ্য

লালসালু

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

কবিতা

সমুদ্রের প্রতি রাবণ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

কবি পরিচিতি

১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি যশোর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে মাইকেল মধুসূদন দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রাজনারায়ণ দত্ত, এবং মাতা জাহ্নবী দেবী। রাজনারায়ণ দত্ত ছিলেন তৎকালে বাংলাদেশের একজন সম্ভ্রান্ত জমিদার। তিনি কলকাতার সদর দেয়ানী আদালতে ওকালতী করতেন।

মধুসূদনের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় সাগরদাঁড়ির গ্রামের পাঠশালায়। সাগরদাঁড়ির দত্ত পরিবারে ঐতিহ্যগতভাবে ফারসি এবং ইংরেজি ভাষার চর্চা বহমান ছিল। মধুসূদনও শৈশব শিক্ষায় প্রধানত ফারসি এবং ইংরেজি ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। গ্রামের পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত করে তিনি কলকাতার হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। এ সময় তিনি ডিরোজিও প্রভাবিত ইয়ং-বেঙ্গল দল দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। বাল্যকাল থেকেই মধুসূদন ইংরেজি কবিতার প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। বিলেত গিয়ে তিনি বড় কবি হবেন। এ-ই ছিল তাঁর বাল্যের স্বপ্ন। এ উদ্দেশ্যেই ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের জন্য হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করেন। এরপর তিনি কলকাতার বিশপ্স কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু লেখাপড়া সমাপ্ত না করেই অনেকটা আকস্মিকভাবে তিনি মাদ্রাজ গমন করেন। ১৮৪৮ সালে মাদ্রাজ পৌঁছার অব্যবহিত পরেই সেখানকার এক এতিমখানার স্কুলে তিনি শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত হন।

মাদ্রাজ বাসকালে, ১৮৪৮ সালে, মধুসূদন রেবেকা ম্যাক্টাভিস নাম্নী এক ইংরেজ নীলকর কন্যাকে বিয়ে করেন। সম্ভবত ১৮৫৬ সালে তিনি হেনরিয়েটা সোফিয়া নাম্নী জনৈক ফরাসি মহিলার পাণি গ্রহণ করেন।

১৮৫৬ সালে মধুসূদন মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। ইতোমধ্যে তাঁর জনক-জননী উভয়েই পরলোকগমন করেন। ১৮৬২ সালে মধুসূদন ইউরোপ যান। তিনি লন্ডনে ব্যারিস্টারী পাস করেন। লন্ডন থেকে তিনি ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে যেয়ে বেশ কয়েক বছর অবস্থান করেন। এ সময় তিনি চরম অর্থনৈতিক সঙ্কটে পতিত হন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এ সময় অর্থ প্রেরণ করে মধুসূদনকে দেনার দায় থেকে মুক্ত করেন ও দেশে ফেরার ব্যবস্থা করেন। কলকাতার উচ্চআদালতে আইন ব্যবসা করে দারিদ্র্যের যন্ণা থেকে সাময়িক মুক্তি অর্জন করেন মধুসূদন। কিন্তু শেষ জীবনে তিনি পুনরায় অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্যে নিপতিত হন এবং কপর্দকশূন্য অবস্থায় হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।

আধুনিক বাংলা কাব্যের ইতিহাসে মধুসূদনের অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। হাজার বছরের বাংলা কাব্যের প্রথাগত ধারায় মাইকেল মধুসূদন দত্তই প্রথম বন্ধনমুক্তির অগ্রনায়ক। বিষয় ভাবনা, জীবনার্থ এবং প্রকরণ-শৈলীর স্বাতন্ত্যে মধুসূদনের রচনা আধুনিকতার শিখরস্পর্শী। অমিত্রাক্ষর ছন্দরীতির আবিষ্কার তাঁর অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় বহন করে। মহাকাব্য, সনেট, পত্রকাব্য, প্রহসন, ট্র্যাজেডি নাটক ইত্যাদি সাহিত্যশাখা বাংলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম প্রবর্তন করেন। মাদ্রাজ বাসকালে তিনি সাংবাদিকতা পেশায়ও সাফল্যের পরিচয় দেন। এ সময় তিনি The Madars Chronicle (১৮৪৩) পত্রিকা সম্পাদনা করেন। প্রথমে ইংরেজি ভাষায় কবিতা রচনা আরম্ভ করলেও, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগী হয়ে ওঠেন এবং বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা করে রেখে যান অক্ষয় অবদান।

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুন কলকাতার আলীপুর জেনারেল হাসপাতালে মাইকেল মধুসূদন দত্ত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের রচনাবলী

কাব্য : তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য (১৮৫৯), মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১), ব্রজাঙ্গনা কাব্য (১৮৬১), বীরাঙ্গনা কাব্য (১৮৬২), চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৫)।

ইরেজি কাব্য : Captive Lady (1848), Visions of the Past (1849).

নাটক : পদ্মাবতী (১৮৫৮), শর্ম্মিষ্ঠা নাটক (১৮৫৯), কৃষ্ণকুমারী নাটক (১৮৫৯), মায়াকানন (অসমাপ্ত,) Rizia (অসমাপ্ত)।

প্রহসন : একেই কি বলে সভ্যতা? (১৮৬০), বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ(১৮৬০)।

গদ্য-কাব্য : হেকটর-বধ (অসমাপ্ত)।

ভূমিকা

মাইকেল মধুসূদন দত্তের সুবিখ্যাত গ্রন্থ, বাংলা সাহিত্যের প্রথম এবং একমাত্র সার্থক মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর প্রথম সর্গ থেকে আলোচ্য কবিতাংশটুকু চয়ন করা হয়েছে। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে দূত মুখে বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ শুনে রাবণ বিচলিত হয়ে ওঠেন। পুত্রের শব দেখার জন্য তিনি প্রাসাদ শিখরে ওঠেন। রণক্ষেত্র দর্শন শেষে তার চোখ পড়ে অদূরবর্তী সমুদ্রের প্রতি। তিনি লক্ষ করেন, লঙ্কার গৌরব সমুদ্রের বুকে শিলার বাঁধ শোভা পাচ্ছে। যে সমুদ্র ছিল চির অজেয়, তা আজ সামান্য রামের কাছে বন্দীত্ব স্বীকার করেছে। এ শোকে-দুঃখে-অভিমানে-বেদনায় রাবণ সমুদ্রকে লক্ষ করে খেদোক্তি করেছে– নির্বাচিত কবিতাংশটির এটিই বিষয়। মূল কাব্যের প্রথম সর্গে আরও অনেক বিষয়ের সঙ্গে এ অংশটুকুও আছে। কিন্তু সেখানে আলোচ্য কাব্যাংশটুকুর কোনো নাম নেই। সঙ্কলক-সম্পাদকরা আলোচ্য কবিতাংশের বর্তমান নাম প্রদান করেছেন।

আলোচ্য কাব্যাংশের শুরুতেই রাবণের দৃষ্টিকোণে লঙ্কাপুরীর সৌন্দর্য বর্ণিত হয়েছে। নগরীর চতুর্দিকে রামের সৈন্যবাহিনী সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছে। রামের সৈন্যবাহিনীর অবস্থান বর্ণনা শেষে কবি রণক্ষেত্রের হৃদয়বিদারক ও বীভৎস রূপ উপস্থাপন করেছেন। এরপর রণক্ষেত্রে পতিত পুত্রের মৃতদেহের ওপর রাবণের চোখ পড়ে। প্রিয়পুত্রের শব দেখে রাবণ বিচলিত, ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। ক্রমে রাবণের চোখ পড়ে অদূরবর্তী সমুদ্রের প্রতি। রামের হাতে শৃঙ্খলিত সমুদ্রকে দেখে রাবণ বিক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হৃদয়ে সমুদ্রের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি উচ্চারণ করেন। যে সমুদ্র ছিল চির অলঙ্ক্য, চির অজেয়- তাই আজ রামের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছে। লঙ্কার প্রতি সমুদ্রের এ বৈরী আচরণের জন্যই রাম লঙ্কানগরীতে আসতে পেরেছে, পতন ঘটেছে লঙ্কার স্বাধীনতার। তাই রাবণ সমুদ্রকে ধিক্কার দিয়েছেন। কেবল ধিক্কারই নয়, তিনি সমুদ্রকে পুনরায় স্বমহিমায় আবির্ভূত হওয়ার জন্যও আহ্বান জানিয়েছেন। এদিক বিবেচনা করেই কাব্যাংশটুকুর নামকরণ করা হয়েছে 'সমুদ্রের প্রতি রাবণ'। তবে সমুদ্রের প্রসঙ্গ ছাড়া আরো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে আলোচ্য কবিতাংশে। লঙ্কাপুরীর ঐশ্বর্য, যুদ্ধক্ষেত্রে, প্রিয়পুত্র বীরবাহুর শব-দর্শন, পুত্রশোকে চিত্রাঙ্গদা দেবীর আকুল কান্না ইত্যাদি প্রসঙ্গ বর্তমান নামকরণের মধ্যে প্রতিভাত হয়নি। সেদিক থেকে বর্তমান নামকরণ যে পূর্ণ সার্থক এমন কথা বলা যাবে না। তবে অন্যদিক থেকে বিবেচনা করলে বলা যায়, সমুদ্র বশ্যতা স্বীকার করেছে বলেই রামচন্দ্র সৈন্যসহ লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করেছে, যুদ্ধে বীরবাহু মারা গেছে এবং সে কারণেই চিত্রাঙ্গদা দেবী হয়ে পড়েছেন শোক-বিহ্বল। এ-দিক বিবেচনায় আনলে, আলোচ্য কবিতাংশের 'সমুদ্রের প্রতি রাবণ' নামকরণের গ্রহণযোগ্যতা অনস্বীকার্য।

মাইকেল মধূসূদন দত্ত মহাকবি বাল্মীকি রচিত 'রামায়ণ' মহাকাব্যের কাহিনী অংশ নিয়ে রচনা করেন 'মেঘনাদবধ কাব্য'। তবে 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ রামায়ণের মূল্যবোধকে ভেঙে দিয়ে মধুসূদন নির্মাণ করেছেন নতুন মূল্যচেতনা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে যে সীমাবদ্ধ নবজাগরণ সংঘটিত হয়েছিল, তারই আলোকে মধুসূদন রামায়ণের কাহিনীকে ভেঙে নতুন জীবনভাবনা প্রকাশ করেছেন। এ কারণেই 'রামায়ণ'-এর ঘৃণিত চরিত্র রাবণ তাঁর কাব্যে হয়েছে নায়ক। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণকে আত্মস্থ করেই নির্মিত হয়েছে রাবণ চরিত্র। 'মেঘনাদবধ কাব্য-এর সম্পর্ণ রাবণ চরিত্রের এক অতি খণ্ড অংশকে আমরা আলোচ্য কবিতাংশে লক্ষ করি।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' আঙ্গিকে মহাকাব্য। মহাকাব্যের একটি খণ্ড অংশকে এখানে গ্রহণ করা হয়েছে। আলোচ্য কবিতাংশটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। চরণের শেষে মিল রাখেন নি বলে মেঘনাদবধ কাব্যের

অক্ষরবৃত্ত ছন্দ 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ' নামে সমধিক পরিচিত। বাংলা কাব্যে এ নতুন ছন্দরীতিরও প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

ইউনিটের উদ্দেশ্য

১. বাংলা সাহিত্যের একমাত্র সার্থক মহাকাব্য "মেঘনাদ বধ" কাব্যের আংশিক পরিচিতি লাভ করবেন।
২. মাইকেল মধুসূদন দত্তের আধুনিক জীবনচেতনার পরিচয় দিতে পারবেন।
৩. অমিত্রাক্ষর ছন্দ-রীতির মূল বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- লঙ্কানগরীর ঐশ্বর্য ও বৈভব বর্ণনা করতে পারবেন।
- লঙ্কানগরী অবরোধকারী রামের সৈন্যবাহিনীর অবস্থান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

☞	মূলপাঠটি নীরবে ও সরবে কয়েকবার পড়ুন এবং বুঝবার চেষ্টা করুন। বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ দেয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।

শব্দার্থ ও টীকা	মুলপাঠ
রাক্ষসপতি – রাক্ষদের পতি বা প্রভু, রাবণ। **প্রাসাদ শিখরে** – প্রাসাদের শীর্ষদেশে, অট্টালিকার চূড়ায়। **কনক-উদয়াচলে** – সোনার বর্ণে রঞ্জিত পূর্ব দিগন্তে। **দিনমণি** – সূর্য। **অংশুমালী** – যা অংশু বা রশ্মির মালা ধারণ করে আছে, সূর্য। সূর্যের চতুর্দিকে রশ্মির জাল বিস্তারিত থাকে বলে সূর্যের আরেক নাম অংশুমালী। **কাঞ্চন** – স্বর্ণ। **কিরীটিনী** – মুকুট পরিহিতা নারী। এখানে লঙ্কানগরীর সুউচ্চপ্রাসাদ বুঝানো হয়েছে, যা লঙ্কানগরীর মুকুট স্বরূপ। **কমল আলয় সর :** – যে সরোবরে পদ্ম ফোটে, এমন। **হীরাচূড়াশির :** – মূল্যবান হীরকখচিত মন্দিরের শীর্ষদেশ। **দেবগৃহ** – দেবতাদের ঘর, মন্দির। **রাগে** – রঙে, বর্ণে। **রঞ্জিত** – রঙিন। **বিপণি** – বাজার, দোকান, পাট। **সদন** – আবাস, গৃহ। **রাক্ষসেশ্বর** – রাক্ষসদের ঈশ্বর। এখানে রাবণকে বুঝানো হয়েছে।	উঠিলা রাক্ষসপতি প্রাসাদ-শিখরে, কনক-উদয়াচলে দিনমণি যেন অংশুমালী। চারিদিকে শোভিল কাঞ্চন– সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা–মনোহরা পুরী! – হেমহর্ম্য সারি সারি পুষ্পবন মাঝে; কমল-আলয় সর : ; উৎস রজচ্ছটা; তরুরাজী, ফুলকুল– চক্ষু-বিনোদন, যুবতীযৌবন যথা, হীরাচূড়াশির : দেবগৃহ; নানা রাগে রঞ্জিত বিপণি, বিবিধ রতন-পূর্ণ; এ জগৎ যেন আনিয়া বিবিধ ধন, পূজার বিধানে, রেখেছে, রে চারুলঙ্কে, তোর পদতলে, জগৎ-বাসনা তুই, সুখের সদন! দেখিলা রাক্ষসেশ্বর উন্নত প্রাচীর– অটল অচল যথা; তাহার উপরে, বীরমদে মত্ত, ফেরে অস্ত্রীদল, যথা শৃঙ্গধরোপরি সিংহ। চারি সিংহদ্বার (রুদ্ধ এবে) হেরিলা বৈদেহী-হর; তথা জাগে রথ, রথী, গজ, অশ্ব, পদাতিক অগণ্য। দেখিলা রাজা নগর বাহিরে, রিপুবৃন্দ, বালিবৃন্দ সিন্ধুতীরে যথা, নক্ষত্র-মণ্ডল কিম্বা আকাশ মণ্ডলে।

অটল – দৃঢ়।

বীরমদে – বীরত্বগর্বে।

বৈদেহীহর – যিনি বিদেহ রাজকন্যা সীতাকে হরণ করেছেন, রাবণ।

রথ – প্রাচীন কালের যান বিশেষ।

রথী – রথে আরোহণকারী সৈনিক।

গজ – হাতি।

পদাতিক – যে পায়ে হেঁটে যুদ্ধ করে।

রিপুবৃন্দ বালিবৃন্দ সিন্ধু তীরে যথা ... মণ্ডলে – সমুদ্র তীরবর্তী বালুকারাশি অথবা আকাশে অবস্থিত তারকারাজির মতো অগণিত শত্রু সৈন্য। সাহিত্যে এ ধরনের তুলনাকে উপমা বলে। যখন সমধর্মী দুই বস্তুর মধ্যে তুলনা করা হয়, তখন সৃষ্টি হয় উপমার। আলোচ্য কবিতায় আমরা এ ধরনের বহু উপমার উপস্থিতি লক্ষ করি।

হানা দিয়া – হামলা করে।

দুর্বার – দুর্দমনীয়, অপ্রতিরোধ্য।

নীল – রামচন্দ্রের বানর বাহিনীর এক বীর যোদ্ধা।

অঙ্গদ – বানররাজ বালির পুত্র, কিষ্কিন্ধ্যার যুবরাজ।

করভসম – হস্তীশাবকের মতো।

বলী – বলবান, শক্তিমান।

কঞ্চুক – খোলস, গাত্রাবরণ।

ভূষিত – সজ্জিত।

হিমান্তে – শীতের শেষে।

অহি – সাপ।

ভ্রমে – ভ্রমণ করে, চলাফেরা করে এমন। ত্রিশূলসদৃশ জিহ্বা ত্রিশূলের মতো তিনভাগে চেরা জিহ্বা, সাপের জিভ তিনভাগে চেরা থাকে বলে কবি এ ধরনের চিত্র নির্মাণ করেছেন।

লুলি – সঞ্চালন করে।

অবলেপে – সদর্পে।

সুগ্রীব – কিষ্কিন্ধ্যার বানর রাজা।

বীরসিংহ – সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী।

দাশরথি – রাজা দশরথের পুত্র, রামচন্দ্র।

এবে – এক্ষণে।

জানকী বিহনে – সীতার অবর্তমানে; সীতা জনক রাজার কন্যা বলে তাকে জানকী বলা হয়েছে।

কৌমুদী – জ্যোৎস্না।

কুমুদরঞ্জন শশাঙ্ক – চন্দ্রের আলোয় পদ্ম শাপলা ইত্যাদি জলজ পুষ্প বিকশিত হয়, তাই চন্দ্রকে কুমুদরঞ্জন বলা হয়েছে।

হানা দিয়া পূর্ব দ্বারে, দুর্বার সংগ্রামে,
বসিয়াছে বীর নীল; দক্ষিণ দুয়ারে
অঙ্গদ, করভসম নব বলে বলী;
কিম্বা বিষধর, যবে বিচিত্র কঞ্চুক–
ভূষিত, হিমান্তে অহি ভ্রমে ঊর্ধ্ব-ফণা-
ত্রিশুলসদৃশ জিহ্বা লুলি অবলেপে!
উত্তর দুয়ারে রাজা সুগ্রীব আপনি
বীরসিংহ। দাশরথি পশ্চিম দুয়ারে–
হায় রে বিষণ্ন এবে জানকী-বিহনে,
কৌমুদী-বিহনে যথা কুমুদরঞ্জন
শশাঙ্ক। লক্ষ্মণ সঙ্গে, বায়ুপুত্র হনু,
মিত্রবর বিভীষণ। শত প্রসরণে,
বেড়িয়াছে বৈরিদল স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী,
গহন কাননে যথা ব্যাধ-দল মিলি,
বেড়ে জালে সাবধানে কেশরিকামিনী–
নয়ন-রমণী রূপে, পরাক্রমে ভীমা
ভীমাসমা!

লক্ষ্মণ – রামচন্দ্রের বৈমাত্রেয় ভাই।
বায়পুত্র হনু – রামায়ণ কাহিনীর অন্তর্গত মহাবীর হনুমান।
মিত্রবর – বিশিষ্ট বন্ধু।
বিভীষণ – রাক্ষসরাজ রাবণের ছোট ভাই। ইনি খুব ধর্মপরায়ণ ছিলেন। রাম-রাবণের যুদ্ধে বিভীষণ রামচন্দ্রের পক্ষাবলম্বন করেন।
প্রসরণে – বেষ্টনে।
বেড়িয়াছে – ঘিরে রেখেছে।
বৈরিদল – শত্রুদল।
গহন – গভীর, ঘন।
কাননে – অরণ্যে, বাগানে।
কেশরিকামিনী – সিংহী।
নয়ন-রমনীরূপে – নয়নাভিরাম সৌন্দর্যে।
ভীমা – প্রচণ্ড শক্তিশালী।
ভীমাসমা – চণ্ডীসদৃশ, দুর্গার মতো।

ভাবসংক্ষেপ

পূর্ব আকাশে নবীন সূর্যের মতো চোখ ঝলসানো দীপ্তি ও শোভা ছড়িয়ে লঙ্কা অধিপতি রাবণ প্রাসাদ শীর্ষে আরোহণ করলেন। প্রথমেই তার চোখ পড়লো লঙ্কানগরীর সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য ও বৈভবের প্রতি। স্বর্ণময় কিরীটশোভিত মনোহর লঙ্কাপুরী। সুদৃশ্য ফুলের বাগানে সারি সারি স্বর্ণময় হর্ম্য, কমলশোভিত সরোবর, রূপার মতো শুভ্র জলধারা ও ফোয়ারা, হীরকচূড়াশোভিত দেবমন্দির, সুসজ্জিত দোকানপাট- ইত্যাদি লঙ্কানগরীকে মনোরম করে তুলেছে। বিশ্ব যেন লঙ্কানগরীর পদমূলে সেরা ধন-রত্ন সমর্পণ করেছে। প্রাসাদশীর্ষ থেকে লঙ্কানগরীর এ মনোহর রূপ দেখে চরম বেদনার মাঝেও রাবণের চিত্তে আনন্দের ধারা বয়ে গেল।

লঙ্কানগরীর সুউচ্চভবনসমূহ দেখার পর রাবণের চোখ পড়ল নগরীর বহির্দেশে। তিনি দেখলেন, সুউচ্চপ্রাচীর লঙ্কানগরীকে বেষ্টন করে আছে। প্রাচীরের উপরে সৈনিকেরা সিংহের মতো বীরদর্পে পাহারা দিচ্ছে। রাবণ দেখলেন, নগরীর চারটি সিংহদ্বারই এখন বন্ধ। সিংহদ্বারের পাশে অগণিত রথ, রথী, হাতি, ঘোড়া ও পদাতিক সৈন্য নিয়োজিত আছে। এরপর রাবণের চোখ পড়ল নগরীর বহির্দেশে অগণ্য শত্রুসৈন্যের প্রতি। রাবণের মনে হলো, সমুদ্রের তীরে যে অগণন বালুকারাশি আছে, কিংবা আকাশে যে অসংখ্য তারা আছে, রামের সৈন্যবাহিনীও তেমনি অগণন। রাবণ দেখলেন, বীর নীল পূর্ব দ্বারে অবস্থান করছে। দক্ষিণ দুয়ারে অঙ্গদ, উত্তর দুয়ারে রাজা সুগ্রীব এবং পশ্চিম দুয়ারে স্বয়ং রামচন্দ্র অবরোধ সৃষ্টি করেছেন। লক্ষ্মণ, হনুমান এবং বিভীষণকেও দেখতে পেলেন রাবণ, রামের সৈন্যবাহিনী লঙ্কানগরীকে বৃত্তাকারে অবরোধ করে রেখেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. উঠিলা রাক্ষসপতি প্রাসাদ শিখরে,
কনক-উদয়াচলে দিনমণি যেন
অংশুমালী।

–রাক্ষসপতি কে? তিনি কেন প্রাসাদ শিখরে আরোহণ করেছিলেন?

২. প্রাসাদ শীর্ষ থেকে রাবণ যেভাবে লঙ্কানগরীকে দেখেছেন, তার পরিচয় দাও।
৩. 'জগৎ-বাসনা তুই, সুখের সদন'। –একথা কে, কাকে এবং কেন বলেছে?
৪. লঙ্কানগরীর চার সিংহদ্বারের কোনটিতে শত্রু পক্ষের কোন বীর অবস্থান করছিল?
৫. কবি রামচন্দ্রের বীর সেনাদের বীরত্বের পরিচয় কিভাবে তুলে ধরেছেন?

উত্তর :

উঠিলা রাক্ষসপতি প্রাসাদ শিখরে,
কনক-উদয়াচলে দিনমণি যেন
অংশুমালী।

–রাক্ষসপতি কে? তিনি কেন প্রাসাদ শিখরে আরোহণ করেছিলেন?

উত্তর : রাম-রাবণের যুদ্ধের এক পর্যায়ে রাবণপুত্র বীরবাহু নিহত হয়। দূতের মুখে বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ জেনে রাবণ স্তম্ভিত হয়ে পড়েন। দূতের কাছে রাবণ ক্রমে জানতে পারেন, সম্মুখ যুদ্ধে বীরবাহু অসংখ্য শত্রুসৈন্য নিধন করে অবশেষে মৃত্যুবরণ করেন। এ সংবাদ শুনে চরম শোকের মাঝেও মহাবীর রাবণ পুত্রের গৌরবদীপ্ত মৃত্যুর জন্য গৌরববোধ করলেন। তাই যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা এবং প্রিয়পুত্র বীরবাহুর মৃতদেহ স্বচক্ষে দেখার জন্য তিনি প্রাসাদ শীর্ষে আরোহণ করলেন।

প্রশ্ন : 'জগৎ-বাসনা তুই, সুখের সদন।' একথা কে, কাকে এবং কেন বলেছে?

উত্তর : লঙ্কার ঐশ্বর্য ও বৈভবের কথা ভাবতে ভাবতে রাক্ষসরাজ রাবণ আলোচ্য উক্তিটি করেছে। কৃষ্ণের বক্ষদেশে রক্ষিত মহামূল্যবান কৌস্তুভমণির মতোই সমুদ্রের শোভাবর্ধনকারী ছিল মনোহর স্বর্ণলঙ্কা। পুত্রের মৃতদেহ দেখার জন্য প্রাসাদ শীর্ষে আরোহণের পর রাবণের চোখে লঙ্কার এ ঐশ্বর্য ও বৈভব ধরা পড়ে। স্বর্ণময় কিরীটশোভিত মনোহর লঙ্কাপুরী। সুদৃশ্য ফুলের বাগানে সারি সারি স্বর্ণময় হর্ম্য কমল শোভিত সরোবর, রূপার মতো শুভ্র জলধারা ও ফোয়ারা, হীরক চূড়াশোভিত দেবমন্দির, সুসজ্জিত দোকানপাট ইত্যাদি লঙ্কানগরীকে মনোরম করে তুলেছে। বিশ্ব যেন লঙ্কানগরীর পদমূলে সেরা ধন-রত্ন সব সমর্পণ করেছে। তাই পরিপূর্ণ সুখের আলয় লঙ্কানগরী বিশ্ববাসীর কাছে পরম আরাধ্য স্থান। এ কারণেই লঙ্কানগরীকে উদ্দেশ্য করে রাবণ আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

প্রশ্ন : লঙ্কানগরীর চার সিংহদ্বারের কোনটিতে কোন বীর অবস্থান করছিল?

উত্তর : রামচন্দ্র ভাসমান শিলার সাহায্যে সেতুনির্মাণ করে লঙ্কানগরীতে উপনীত হন। পরে তিনি লঙ্কানগরীকে বৃত্তাকারে অবরোধ করে ফেলেন। লঙ্কানগরীতে অনুপ্রবেশের জন্য ছিল চারটি মূল সিংহদ্বার। কৌশলগত কারণে এ চারটি সিংহদ্বার অবরোধ করাই রামচন্দ্র যুক্তিযুক্ত মনে করেন। কেননা, অবরুদ্ধ থাকলে রাবণের সৈন্যরা নগরের বাইরে এসে যুদ্ধ করতে পারবে না। এজন্য রামচন্দ্র লঙ্কাপুরীর চার সিংহদ্বার চারজন বীর সেনানীকে নিয়োজিত করেন। লঙ্কা পূর্বদ্বারে অবস্থান নিলেন মহাবীর নীল, দক্ষিণ দুয়ারে অঙ্গদ, উত্তর দ্বারে বীরসিংহ রাজা সুগ্রীব আর পশ্চিমদ্বারে স্বয়ং রামচন্দ্র। এভাবে চার বীরযোদ্ধা লঙ্কানগরীকে চারদিক থেকে অবরোধ করে ফেলে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

ব্যাখ্যা

১. এ জগৎ যেন
আনিয়া বিবিধ ধন, ... তুই, সুখের সদন!
২. দেখিলা রাজা নগর বাহিরে ..... নক্ষত্রমণ্ডল কিংবা আকাশ মণ্ডলে।
৩. দাশরথি পশ্চিম দুয়ারে– ..... শশাঙ্ক।
৪. উঠিলা রাক্ষপতি প্রাসাদ শিখরে, ... অংশুমালী।

উত্তর :

এ জগৎ যেন ..... তুই, সুখের সদন!

আলোচ্য অংশটুকু মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিরচিত 'সমুদ্রের প্রতি রাবণ' শীর্ষক কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে। লঙ্কার ঐশ্বর্য ও বৈভবের কথা ভাবতে ভাবতে রাক্ষসরাজ রাবণ আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

কৃষ্ণের বক্ষদেশে রক্ষিত মহামূল্যবান কৌস্তুভ-মণির মতোই সমুদ্রের শোভাবর্ধনকারী ছিল রাবণের মনোহর লঙ্কানগরী। পুত্রের মৃতদেহ দেখার জন্য প্রাসাদ শীর্ষে আরোহণের পর রাবণের চোখে লঙ্কার এ ঐশ্বর্য ও বৈভব চোখে পড়ে। স্বর্ণময় কিরীট শোভিত মনোহর লঙ্কাপুরী। সুদৃশ্য ফুলের বাগানে সারি সারি স্বর্ণময় হর্ম্য, কমল শোভিত সরোবর, রূপার মতো শুভ্র জলধারা ও ফোয়ারা, হীরক চূড়াশোভিত দেবমন্দির, সুসজ্জিত দোকানপাট ইত্যাদি লঙ্কানগরীকে মনোরম করে তুলেছে। বিশ্ব যেন লঙ্কানগরীর পদমূলে সেরা ধন-রত্ন সব সমর্পণ করেছে। তাই পরিপূর্ণ সুখের আলয় লঙ্কানগরী বিশ্ববাসীর কাছে পরম আরাধ্য স্থান। এ কারণেই লঙ্কানগরীকে উদ্দেশ্য করে রাবণ আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

দেখিলা রাজা নগর বাহিরে, ... নক্ষত্রমণ্ডল কিংবা আকাশ মণ্ডলে।

আলোচ্য অংশটুকু মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিরচিত 'সমুদ্রের প্রতি রাবণ' শীর্ষক কবিতা থেকে গৃহীত হয়েছে। প্রাসাদ-শীর্ষ থেকে শত্রুসৈন্য দেখার পর রাবণ আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

দূতের মুখে প্রিয়পুত্র বীরবাহুর মৃত্যুর খবর শোনার পর রাবণ পুত্রের মৃতদেহ দেখার জন্য প্রাসাদ শীর্ষে আরোহন করেন। প্রথমে তার চোখ পড়ে মনোহর লঙ্কানগরীর প্রতি। নগরীর সুউচ্চভবনসমূহ দেখার পর রাবণের দৃষ্টি নিপতিত হলো রামের সৈন্যবাহিনীর দিকে। নগরীর বহির্দেশে রামের সৈন্যবাহিনী লঙ্কাপুরীকে অবরোধ করে আছে। রাবণ দেখলেন যে, নগর রক্ষাকারী প্রাচীরের উপরে সৈনিকেরা সিংহের মতো বীরদর্পে পাহারা দিচ্ছে। নগরীর চারটি সিংহদ্বারই এখন বন্ধ। সিংহদ্বারের পাশে অগণিত রথ, রথী, হাতি, ঘোড়া ও পদাতিক, সৈন্য নিয়োজিত আছে। এরপর রাবণের চোখ পড়ল নগরীর বাইরের অগণ্য শত্রুসৈন্যের প্রতি। রাবণের মনে হলো, সমুদ্রের তীরে যে অগণন বালুকারাশি আছে, কিংবা আকাশে যে অসংখ্য তারা আছে, রামের সৈন্যবাহিনীও তেমনি অগণন। রামের এ অগণন সৈন্যবাহিনী দেখে রাবণ আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।
- পুত্রের মৃতদেহ দেখার পর রাবণের মানসিক অবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
হেরিলা – দেখিল। **শিবাকুল** – শৃগালের দল। **গৃধিনী** – শকুন জাতীয় পাখি। **পিশাচদল** – অশরীরী জীবসমূহ। **পাকশাট মারি** – পাখা ঝাপটিয়ে, ডানা ঝাপটা দিয়ে। **গরজি** – গর্জন করে। **নাশে** – দূর করে। **ক্ষুধা অগ্নি** – ক্ষুধারূপ অগ্নি, অত্যধিক ক্ষুধা।	অদূরে হেরিলা রক্ষঃপতি রণক্ষেত্র শিবাকুল, গৃধিনী, শকুনি, কুক্কুর, পিশাচদল ফেরে কোলাহলে। কেহ উড়ে, কেহ বসে; কেহ বা বিবাদে; পাকশাট মারি কেহ খেদাইছে দূরে সমলোভী জীবে; কেহ গরজি উল্লাসে, নাশে ক্ষুধা-অগ্নি; কেহ শোষে রক্তস্রোতে। পড়েছে কুঞ্জরপুঞ্জ ভীষণ আকৃতি; ঝড়গতি ঘোড়া, হায়, গতিহীন এবে!

শোষে – শোষণ করে।
কুঞ্জরপুঞ্জ – হাতির দল।
নিষাদী – গজারোহী সৈনিক।
সাদী – অশ্বারোহী সৈনিক।
শূলী – শূল হস্তে যুদ্ধ করে যে সৈন্য।
বর্ম – গায়ের আবরণ।
চর্ম – চামড়া। এখানে চামড়ার আবরণ।
ভিন্দিপাল – ক্ষেপণযোগ্য প্রাচীন অস্ত্রবিশেষ।
তূণ – তীর রাখার পাত্র।
মুদগর – মুগুর।
পরশু – কুঠার।
শীর্ষক – শিরস্ত্রাণ। মাথার আবরণ।
মহাতেজস্কর – অত্যন্ত দীপ্তিময়।
যন্দীদল – বাদকদল।
হৈমধ্বজ – স্বর্ণখচিত পতাকা।
যম-দণ্ডাঘাতে – যমের মতো আঘাতে।
ধ্বজবহ – পতাকা বহনকারী।
স্বর্ণচূড় – ধান পাকার পর তার শীর্ষদেশ স্বর্ণময় হয়, তাই।
রাক্ষসনিকর – রাক্ষসগণ।
রবিকুলরবি – সূর্য বংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান, রামচন্দ্র।
শূর – বীর।
রাঘবের – রামচন্দ্রের। রঘু-বংশোদ্ভূত বলে রামচন্দ্রকে রাঘব বলা হয়।
রিপুচয় – শত্রুদল।
বলী – বীর, বলবান।
হিড়িম্বা – ভীমের স্ত্রী।
গরুড় – প্রচীনকালের বিশালাকায় পাখি, বিষ্ণুর বাহন।
ঘটোৎকচ – ভীমের রাক্ষসী স্ত্রী হিড়িম্বার গর্ভজাত পুত্র।
কর্ণ – মহাভারতে বর্ণিত বীর যোদ্ধা।
কালপৃষ্ঠধারী – যিনি কাল-পৃষ্ঠ নামক বিখ্যাত ধনুক ধারণ করতেন।
এড়িলা – নিক্ষেপ করলেন।
একাঘ্নি বাণ – কর্ণের দেবদত্ত বাণ, যা নিশ্চিতভাবে মাত্র একজনকে বধ করতে পারতো।
কৌরবে – কুরুবংশীয়দের।
মহাশোকে – গভীর দুঃখে।

চূর্ণ রথ অগণ্য নিষাদী, সাদী, শূলী,
রথী, পদাতিক পড়ি যায় গড়াগড়ি
একত্রে। শোভিছে বর্ম, চর্ম, অসি, ধনুঃ
ভিন্দিপাল, তূণ; শর, মুদ্‌গর, পরশু,
স্থানে স্থানে, মণিময় কিরীট, শীর্ষক,
আর বীর-আভরণ, মহাতেজস্কর।
পড়িয়াছে যন্দীদল যন্দল মাঝে।
হৈমধ্বজ দণ্ড হাতে, যম-দণ্ডাঘাতে,
পড়িয়াছে ধ্বজবহ হায় রে, যেমতি
স্বর্ণ-চূড় শস্য ক্ষেত কৃষিদলবলে,
পড়ে ক্ষেত্রে, পড়িয়াছে রাক্ষসনিকর,
রবিকুলরবি শূর রাঘবের শরে!
পড়িয়াছে বীরবাহু বীর-চূড়ামণি,
চাপি রিপুচয় বলী, পড়েছিল যথা
হিড়িম্বার স্নেহনীড়ে পালিত গরুড়
ঘটোৎকচ, যবে কর্ণ, কালপৃষ্ঠধারী
এড়িলা একাঘ্নি বাণ রক্ষিতে কৌরবে।

মহাশোকে শোকাকুল কহিলা রাবণ; –
"যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার
প্রিয়তম, বীরকুল-সাধ এ শয়নে
সদা! রিপুদলবলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়, শত ধিক্ তারে!
তবু বৎস, যে হৃদয়, মুগ্ধ মোহমদে
কোমল সে ফুলসম। এ বজ্র-আঘাতে,
কত যে কাতর সে, তা জানেন সে জন,
অন্তর্যামী যিনি, আমি কহিতে অক্ষম।
হে বিধি, এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী ; –
পরের যাতনা কিন্তু দেখি কি হে তুমি
হও সুখী? পিতা সদা পুত্রদুঃখে দুঃখী–
তুমি হে জগৎ-পিতা, এ কি রীতি তব?
হা পুত্র। হা বীরবাহু! বীরেন্দ্র-কেশরী!
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে?"

রিপুদলবলে – শত্রুপক্ষকে।
দলিয়া – দলন করে, নিষ্পেষিত করে।
মোহমদে – মোহের নেশায়।
ফুলসম – ফুলের মতো।
অন্তর্যামী – যিনি অন্তরের কথা জানেন, ঈশ্বর।
ভবভূমি – পৃথিবী।
লীলাস্থলী – লীলার স্থল।
বীরেন্দ্র কেশরী – বীরশ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রতুল্য বীর ও সিংহের মতো শক্তিশালী।
বিহনে – অবর্তমানে।

ভাবসংক্ষেপ

লঙ্কানগরীর সুউচ্চভবন এবং সিংহদরজায় অবরোধকারী শত্রুসৈন্য দেখার পর রাবণের চোখ পড়ল রণক্ষেত্রের দিকে। রণক্ষেত্রে শিয়াল, শকুনি, কুকুর প্রভৃতি মাংসভূক প্রাণী ভীতিজনক ও বীভৎস পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। মাংসাশী প্রাণীসমূহ পরস্পর রেষারেষি করে সৈনিক ও জীবজন্তুর শবদেহ ভক্ষণ করছে। হাতি, ঘোড়া ও নানা শ্রেণীর সৈনিক, যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সামগ্রীতে যুদ্ধক্ষেত্র পরিপূর্ণ। কৃষকদের কাস্তের টানে যেমন পাকা ফসল কর্তিত হয়ে শস্যক্ষেত্রে পড়ে থাকে, রামচন্দ্রের শরের আঘাতে তেমনি অগণিত রাক্ষসসৈন্য রণক্ষেত্রে পড়ে আছে। এসব সৈন্যের শবদেহ যুদ্ধক্ষেত্রে যেন মরা মানুষের পাহাড় তৈরি করেছে। এ-সব সৈন্যের শবদেহের সঙ্গে রাবণের প্রিয়পুত্র বীরবাহুর শবদেহও যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে আছে।

মৃত্যুশয্যায় শায়িত বীরবাহুর শবদেহ দেখতে পেয়ে রাবণ শোকে ও বেদনায় বিমর্ষ হয়ে পড়েন। পুত্রশোকে বিহ্বল রাবণ আর্তনাদ ও বিলাপ করলেন। চরম বেদনার মাঝেও রাবণের চিত্তলোকে আনন্দ দেখা দিল। জন্মভূমি রক্ষাহেতু প্রিয় পুত্রের আত্মবিসর্জনে রাবণ গর্ববোধ করলেন। বিধাতা কেন তাকে এ শোক দিলেন, তা তিনি বুঝতে পারছেন না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর লিখুন

১. প্রাসাদ-শীর্ষ থেকে রাবণ যেভাবে যুদ্ধক্ষেত্র দেখতে পেয়েছেন তার বর্ণনা দিন।
২. সমরক্ষেত্রে বীরবাহুর মৃতদেহ দেখে রাবণের চিত্তলোকে কোন ভাবের উদয় হলো?
৩. যুদ্ধক্ষেত্রে বীরবাহু কিভাবে পড়ে ছিলেন?
৪. জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়, শত ধিক তারে!
–কে, কখন এবং কাকে উদ্দেশ্য করে এ উক্তিটি করেছেন?

উত্তর

প্রশ্ন : প্রাসাদ শীর্ষ থেকে রাবণ যেভাবে যুদ্ধক্ষেত্র দেখতে পেয়েছেন, তার বর্ণনা দিন।

উত্তর : দূতমুখে বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ শোনার পর পুত্রের মৃতদেহ দেখার জন্য রাবণ প্রাসাদ শীর্ষে আরোহণ করলেন। লঙ্কানগরীর সুউচ্চভবন এবং সিংহদরজায় অবরোধকারী শত্রুসেন্য দেখার পর রাবণের চোখ পড়ল রণক্ষেত্রের দিকে। রণক্ষেত্রে শিয়াল, গৃধিনী, শকুন, কুকুর এবং পিশাচদল ভীতিজনক বীভৎস পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। হাতি, ঘোড়া, নানা শ্রেণীর সৈনিক ও জীবজন্তুর শবদেহ ভক্ষণের উদ্দেশ্যে মাংসাশী প্রাণীসমূহের মধ্যে কোলাহল ও রেষারেষি চলছে। মৃত হাতি ঘোড়া এবং সৈনিকের দেহে যুদ্ধক্ষেত্র পরিপূর্ণ। যুদ্ধাস্ত্র এবং যুদ্ধের নানা সামগ্রী ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। কৃষকদের

কাস্তের টানে যেমন পাকা ফসল কর্তিত হয়ে শস্যক্ষেত্রে পড়ে থাকে, রামচন্দ্রের শরের আঘাতে তেমনি অগণিত রাক্ষসসৈন্য রণক্ষেত্রে পড়ে আছে। সৈন্যের শবদেহ যুদ্ধক্ষেত্রে যেন মরা মানুষের পাহাড় তৈরি করেছে। নানা শ্রেণীর সৈন্যের শবদেহের সঙ্গে রাবণের প্রিয়পুত্র বীরবাহুর শবদেহও যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে আছে।

প্রশ্ন : জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়, শত ধিক তারে!
–কে, কখন এবং কাকে উদ্দেশ্য করে এ উক্তিটি করেছেন?

উত্তর : দূতমুখে প্রিয়পুত্র বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ শোনার পর পুত্রের মৃতদেহ দেখার জন্য রাবণ প্রাসাদ শীর্ষে আরোহণ করেন। লঙ্কানগরীর সুউচ্চভবন, সিংহদরজা এবং অবরোধকারী শত্রুসৈন্য দেখার পর রাবণের চোখ পড়ে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে। বিভিন্ন শ্রেণীর সৈনিক, হাতি, ঘোড়া প্রভৃতির শবদেহ দেখার পর রাবণ তার প্রিয়পুত্র বীরবাহুর মৃতদেহ দেখতে পান। পুত্রের শবদেহ দেখার পর রাবণ শোকে ও বেদনায় বিমর্ষ হয়ে পড়েন। পুত্রশোকে বিহ্বল রাবণ আর্তনাদ ও বিলাপ করলেন। চরম বেদনার মাঝেও হঠাৎ রাবণের চিত্তলোকে আনন্দ দেখা দিল। জন্মভূমি রক্ষার জন্য প্রিয় পুত্রের আত্মবিসর্জনে রাবণ গর্ববোধ করলেন। প্রকৃত বীরমাত্রই দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জনে হাসিমুখে এগিয়ে আসেন। জন্মভূমিকে রক্ষার জন্য আত্মবিসর্জন দেয়া প্রত্যেক বীরেরই পরম আরাধ্য। বীর হয়েও কেউ যদি জন্মভূমি রক্ষার আত্মবিসর্জনে অগ্রসর না হয়, তবে সে নিতান্তই কাপুরুষ এবং বীরকুলের ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার পাত্র। বীরবাহুর মৃতদেহ দেখে রাবণের বুক তাই গর্বে ভরে গেল, কেননা বীরবাহু দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. হায় রে যেমতি ..... রবিকুলরবি শূল রাঘবের শরে!
২. জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে? ..... যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়, শত ধিক্ তারে!
৩. হা পুত্র! হা বীরবাহু! বীরেন্দ্র কেশরী! .....কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিহনে?

জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে? .....যে ডরে ভীরু সে মূঢ়; শত ধিক তারে!

আলোচ্য অংশটুকু মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'মেঘনাদবধ' কাব্যের প্রথম সর্গের অন্তর্গত 'সমুদ্রের প্রতি রাবণ' শীর্ষক কবিতাংশ থেকে চয়ন করা হয়েছে। জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বীরবাহুর আত্মবিসর্জনে রাবণের চিত্তলোকে যে গৌরববোধের জন্ম দিয়েছে, এখানে তা বলা হয়েছে।

দূতমুখে প্রিয়পুত্র বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ শোনার পর পুত্রের মৃতদেহ দেখার জন্য রাবণ প্রাসাদ শীর্ষে আরোহণ করেন। লঙ্কানগরীর সুউচ্চভবন, সিংহদ্বার এবং অবরোধকারী শত্রুসৈন্য দেখার পর রাবণের চোখ পড়ে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে। বিভিন্ন শ্রেণীর সৈনিক, হাতি, ঘোড়া প্রভৃতির শবদেহ দেখার পর রাবণ তার প্রিয়পুত্র বীরবাহুর মৃতদেহ দেখতে পান। পুত্রের শবদেহ দেখার পর রাবণ শোকে ও বেদনায় বিমর্ষ হয়ে পড়েন। পুত্রশোকে বিহ্বল রাবণ আর্তনাদ ও বিলাপ করলেন। চরম বেদনার মাঝেও হঠাৎ রাবণের চিত্তলোকে আনন্দ দেখা দিল। জন্মভূমি রক্ষার জন্য প্রিয়পুত্র বীরবাহুর আত্মবিসর্জনে রাবণ গর্ববোধ করলেন। প্রকৃত বীরমাত্রই দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জনে হাসিমুখে এগিয়ে আসেন। জন্মভূমিকে রক্ষার জন্য আত্মবিসর্জন দেয়া প্রত্যেক বীরেরই পরম আরাধ্য। বীর হয়েও কেউ যদি জন্মভূমি রক্ষার আত্মবিসর্জনে অগ্রসর না হয়, তবে সে নিতান্তই কাপুরষ এবং বীরকুলের ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার পাত্র।

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- সমুদ্রের প্রতি রাবণের ক্ষোভ ও অভিমানের পরিচয় প্রদান করতে পারবেন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
আক্ষেপিয়া – আক্ষেপ করে। **রাক্ষর ঈশ্বর** – রাক্ষসদের অধিপতি, রাজা রাবণ। **মকরালয়** – সাগর। **শিলাকুল** – প্রস্তরসমূহ। **তরঙ্গ নিচয়** – তরঙ্গমালা, ঢেউরাশি। **ফণামর** – ফণাবিশিষ্ট। **ফণিবর** – বিশাল বা শ্রেষ্ঠ সর্প। **উথলিছে** – উপচে পড়ছে। **নিরন্তর** – সর্বদা। **বীরকুলর্ষভ** – বীরকুলের শ্রেষ্ঠ। **প্রচেত :** – বরুণ, সমুদ্র। **জলদলপতি** – সমুদ্র। **প্রভঞ্জনবৈরী** – সমুদ্রকে ঝড়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। **নিগড়** – শৃঙ্খল। **কেশরীর** – সিংহের। **বীতংসে** – ফাঁদ দ্বারা। **হৈমবতীপুরী** – স্বর্ণময়ী লঙ্কাপুরী। **শোভে** – শোভা পায়। **নীলাম্বুস্বামী** – নীল জলরাশির যিনি প্রভু, সাগর। **কৌস্তুভ রতন** – পুরাণে বর্ণিত মহামূল্য মণিবিশেষ, কৃষ্ণের ভূষণ। **মাধব** – কৃষ্ণ। **বলী** – শক্তিশালী। **জাঙাল** – অবরোধ, প্রতিবন্ধকতা। **রিপু** – শত্রু। **বারীন্দ্র** – জলের অধিপতি, সমুদ্র।	এরূপে আক্ষেপিয়া রাক্ষস-ঈশ্বর রাবণ, ফিরায়ে আঁখি, দেখিলেন দূরে সাগর-মকরালয়। মেঘশ্রেণী যেন অচল, ভাসিছে জলে শিলাকুল বাঁধা দৃঢ় বাঁধে। দুই পাশে তরঙ্গ-নিচয়, ফেনাময়, ফণাময় যথা ফণিবর, উথলিছে নিরন্তর গভীর নির্ঘোষে। অপূর্ব-বন্ধন সেতু; রাজপথ-সম প্রশস্ত; বহিছে জলস্রোতঃ কলরবে, স্রোত-পথে জল যথা বরিষার কালে। অভিমানে মহামানী বীরকুলর্ষভ রাবণ, কহিলা বলী সিন্ধু পানে চাহি; “কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে, প্রচেতঃ! হা ধিক্ ওহে জলদলপতি! এ কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য অজেয় তুমি? হায়, এ কি হে তোমার ভূষণ, রত্নাকর? কোন্ গুণে, কহ, দেব শুনি, কোন গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে? প্রভঞ্জনবৈরী তুমি! প্রভঞ্জন সম ভীম পরাক্রমে! কহ, এ নিগড় তবে পর তুমি কোন পাপে? অধম ভালুকে শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে; কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে বীতংসে? এ যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী, শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বুস্বামী, কৌস্তুভ-রতন যথা মাধবের বুকে, কেন হে নির্দয় এবে তুমি এর প্রতি? উঠ বলি; বীরবলে এ জাঙাল ভাঙি, দূর কর অপবাদ; জুড়াও এ জ্বালা, ডুবিয়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু। রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক-রেখা, হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি।”

ভাবসংক্ষেপ

পুত্রের মৃতদেহ দেখার পর রাবণের চোখ পড়ল লঙ্কার অদূরবর্তী দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্রের প্রতি। তিনি সমুদ্রের বুকে রামচন্দ্রের শিলা নির্মিত সুদৃশ্য সেতু দেখতে পেলেন। সেই সেতু দিয়ে অগণন বানর সৈন্য লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করেছে। সমুদ্রের শৃঙ্খলদশা দেখে তিনি ব্যথিত চিত্তে সমুদ্রকে ধিক্কার জানালেন। সমুদ্র চির অজেয় ও চির অলঙ্ঘ্য। সেই সমুদ্র কি করে রামের বশ্যতা স্বীকার করলো, রাবণ তা ভেবে পাননি। তাই তিনি সমুদ্রকে আহ্বান জানিয়েছেন, সমুদ্র যেন তার বন্ধন দশা অতিক্রম করে আবার স্বমহিমায় প্রত্যাবর্তন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. রাবণ সমুদ্রকে ধিক্কার জানিয়েছেন কিভাবে?

২. 'কৌস্তুভ রতন যথা মাধবের বুকে'- কে কি প্রসঙ্গে এ কথা বলেছেন।

৩. 'রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক রেখা'- কে, কাকে কোন প্রসঙ্গে একথা বলেছে?

উত্তর

প্রশ্ন : রাবণ সমুদ্রকে ধিক্কার জানিয়েছেন কিভাবে?

উত্তর : মাধবের বুকে রক্ষিত মহামূল্যবান কৌস্তুভ রত্নের মতো সমুদ্রবক্ষে শোভা পায় স্বর্ণলঙ্কাপুরী। অথচ সেই স্বর্ণলঙ্কা আজ শত্রুসৈন্য পরিবেষ্টিত। শত্রুদের লঙ্কানগরীতে আসতে সাহায্য করেছে অজেয় সমুদ্র। রামচন্দ্র সমুদ্রের বুকে শিলাময় যে সেতু নির্মাণ করেছে, ক্রমে রাবণ তা দেখতে পেলেন এ সেতু দিয়ে অগণন বানর-সৈন্য লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করছে। সমুদ্রের শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থা দেখে তিনি ব্যথিত চিত্তে সমুদ্রকে ধিক্কার জানালেন। সমুদ্র অজেয় ও অলঙ্ঘ্য। সেই সমুদ্র কী করে রামের বশ্যতা স্বীকার করলো, রাবণ তা ভেবেই পেলেন না।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেত : !

২. রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক রেখা
হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি!

উত্তর :

কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেত : !

আলোচ্য অংশটুকু মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিরচিত 'মেঘনাদবধ' কাব্যের প্রথম সর্গের অন্তর্গত 'সমুদ্রের প্রতি রাবণ' শীর্ষক কবিতাংশ থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে সমুদ্রের প্রতি রাবণ তীব্র শ্লেষ ও ধিক্কার প্রকাশ করেছেন।

মাধবের বুকে রক্ষিত মহামূল্যবান কৌস্তুভ রত্নের মতো সমুদ্রবক্ষে শোভা পায় স্বর্ণলঙ্কাপুরী। অথচ সেই স্বর্ণলঙ্কা আজ শত্রুসৈন্য পরিবেষ্টিত। শত্রুদের লঙ্কানগরীতে আসতে সাহায্য করেছে অজেয় সমুদ্র। সমুদ্রের বুকে শিলা নির্মিত ভাসমান সেতু দেখতে পেলেন রামচন্দ্র। সেই সেতু দিয়ে অগণন বানর সৈন্য লঙ্কনগরীতে প্রবেশ করছে। সমুদ্রের এ শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপ দেখে রাবণ ব্যথিত চিত্তে সমুদ্রকে ধিক্কার জানালেন। ব্যঙ্গচ্ছলে রাবণ বললেন, 'হে সমুদ্র, তুমি আজ সুন্দর একটা মালা পরেছো তোমার গলায়!' এভাবে সমুদ্রের প্রতি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে।

পাঠ ৪

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- রাবণের স্ত্রী চিত্রাঙ্গদা দেবীর পুত্রশোকে বিহ্বল অবস্থার পরিচয় দিতে পারবেন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
এতেক কহিয়া – একথা বলে। **রাজরাজেন্দ্র** – রাজাধিরাজ, রাজার রাজা। **কনক-আসনে** – স্বর্ণনির্মিত আসনে। **মহামতি** – মহৎ স্বভাব সম্পন্ন। **চৌদিকে** – চতুর্দিকে। **কিঙ্কিনীর বোল** – অলঙ্কারের শব্দ। **ঘোর বোলে** – প্রবল শব্দে। **হেমাঙ্গী** – গৌরবর্ণা, ফর্সা। **আলুথালু** – এলোমেলো, বিশৃঙ্খল। **আভরণহীন** – অলঙ্কার শূন্য। **হিমানী** – শীত। **কবরীবন্ধন** – খোঁপার বাঁধন। **পদ্মপর্ণ** – পদ্মের পাতা। **বিবশা** – বিহ্বলা, বাহ্যজ্ঞান রহিতা। **বিহঙ্গিনী** – নারী পক্ষী। **কালফণি** – যমসদৃশ সাপ। **কুলায়ে** – নীড়ে, পাখির বাসায়। **পশিয়া** – প্রবেশ করে। **সুর সুন্দরী** – স্বর্গের অপ্সরী। **বামাকুল** – নারীরা। **আসার** – বৃষ্টিপাত। **জীমূত-মন্দ্র** – মেঘের গর্জন। **তিতি** – ভিজে। **নেত্রনীরে** – চোখের জল। **কিঙ্করী** – দাসী। **দৌবারিক** – দ্বাররক্ষক, পাহারাদার। **নিষ্কোষিলা** – খাপ থেকে তরবারি বের করে আনা। **ভীমরূপী** – ভয়ঙ্কর, ভীষণ।	এতেক কহিলা পুনঃ রাজরাজেন্দ্র রাবণ, আসিয়া বসিলা পুনঃ কনক-আসনে সভাতলে; শোকে মগ্ন বসিলা নীরবে মহামতি; পাত্র মিত্র, সভাসদ্-আদি বসিয়া চৌদিকে, আহা, নীরব বিষাদে। হেন কালে চারিদিকে সহসা ভাসিল রোদন-নিনাদ মৃদু; তা সহ মিশিয়া বালি নূপুরধ্বনি, কিঙ্কিনীর বোল ঘোর রোলে। হেমাঙ্গী সঙ্গিনীদল-সাথে, প্রবেশিলা সভাতলে চিত্রাঙ্গদা দেবী। আলুথালু, হায় এবে কবরী বন্ধন। আভরণহীন দেহ, হিমানীতে যথা কুসুমরতনহীন বন-সুশোভিনী লতা! অশ্রুময় আঁখি, নিশার শিশির- পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন! বীরবাহু-শোকে বিবশা রাজমহিষী, বিহঙ্গিনী যথা, যবে গ্রাসে কাল ফণী কুলায়ে পশিয়া শাবকে। শোকের ঝড় বহিল সভাতে। সুর-সন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে বামাকুল;মুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন নিঃশ্বাস প্রলয় বায়ুঃ অশ্রুবারি ধারা আসার;জীমূত-মন্দ্র হাহাকার রব। চমকিলা লঙ্কাপতি কনক-আসনে। ফেলিল চামর দূরে তিতি নেত্রনীরে কিঙ্করী; কাঁদিল ফেলি ছত্র ছত্রধর! ক্ষোভে, রোষে, দৌরারিক নিষ্কোশিলা অসি ভীমরূপ; পাত্র মিত্র, সভাসদ্ যত অধীর, কাঁদিলা সবে ঘোর কোলাহলে।

ভাবসংক্ষেপ

সমুদ্রকে ধিক্কার জানানোর পর রাবণ পুনরায় সভাস্থলে ফিরে এসে সিংহাসনে উপবেশন করলেন। তিনি এবং অন্য সভাসদেরা গভীর শোকে মুহ্যমান। এমন সময় চারদিকে মৃদু ক্রন্দনধ্বনি শোনা গেল। তার সঙ্গে ভেসে এল অলঙ্কার ও নূপুরের শব্দ। বীরবাহুর মাতা এবং রাবণ মহিষী চিত্রাঙ্গদা দেবী সহচরীদের সাথে নিয়ে সভাস্থলে প্রবেশ করলেন।

চিত্রাঙ্গদা দেবীর শোকাকুল বিষণ্ন রূপ দেখে সভাস্থ সকলেই বিচলিত হলেন। সভায় শোকের ঝড় প্রবাহিত হলো। কান্নার রোলে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে গেল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর লিখুন

১. পুত্রশোকে বিহ্বল চিত্রাঙ্গদা দেবীর মানসিক অবস্থা বর্ণনা করুন।

২. 'শোকের ঝড় বহিল সভাতে'। –কোথায়, কি কারণে শোকের ঝড় প্রবাহিত হলো?

৩. চিত্রাঙ্গদা দেবী কি অবস্থায় রাজসভায় প্রবেশ করেছিলেন?

উত্তর :

প্রশ্ন : পুত্রশোকে বিহ্বল চিত্রাঙ্গদা দেবীর মানসিক অবস্থা বর্ণনা করুন।

উত্তর : দূত মকরাক্ষের মুখে বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ জানার পর রাবণ প্রাসাদশীর্ষ থেকে লঙ্কানগরী, যুদ্ধক্ষেত্র, সমুদ্র ইত্যাদি দেখার পর পুনরায় সভাস্থলে ফিরে এসে সিংহাসনে উপবেশন করেছেন। এমন সময় চারদিকে কান্নার মৃদুরোল শোনা গেল। নূপুর এবং কঙ্কণের শব্দ শোনা গেল। বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ জেনে রাণী চিত্রাঙ্গদা সুন্দরী সহচরী পরিবেষ্টিতা হয়ে রাজসভায় প্রবেশ করলেন। রাবণ মহিষী এবং বীরবাহুর মাতা চিত্রাঙ্গদা দেবী শোকে মুহ্যমান। চিত্রাঙ্গদা দেবী রাজসভায় যখন প্রবেশ করলেন, তখন তার খোঁপা ছিল বন্ধনমুক্ত, কেশরাশি ছিল অবিন্যস্ত ও আলুথালু। চিত্রাঙ্গদার দেহ ছিল নিরাভরণ। তাকে দেখতে শিশির সিক্ত পুষ্পহীন লতার মতোই দেখাচ্ছিল। তার দুই চোখ ছিল শিশিরসিক্ত পদ্মপাতার ন্যায়। পুত্রশোকে চিত্রাঙ্গদা দেবী ছিলেন রীতিমতো উন্মাদিনী। বিষধর সাপ সন্তর্পণে পাখির বাসায় ঢুকে পক্ষিশাবক গ্রাস করলে পক্ষিমাতা যেমন মর্মবেদনায় ছটফট করে, পুত্রশোকাতুরা রাজমহিষী চিত্রাঙ্গদা দেবীও তেমনি গভীর মর্মযাতনায় বুক চাপড়ে মরছিলেন।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. শোকের ঝড় বহিল সভাতে

২. পাত্র মিত্র, সভাসদ যত
অধীর, কাঁদিলা সবে ঘোর কোলাহলে।

উত্তর :

শোকের ঝড় বহিল সভাতে

আলোচ্য অংশটুকু মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিরচিত 'মেঘনাদবধ' কাব্য থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। চিত্রাঙ্গদা দেবী রাজসভায় প্রবেশ করার পর সকলের মাঝে শোক কিভাবে সঞ্চারিত হলো, তা-ই আলোচ্য অংশে বলা হয়েছে।
দূতের মুখে বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ জানার পর রাবণ প্রাসাদশীর্ষ থেকে লঙ্কানগরী, যুদ্ধক্ষেত্র, বীরবাহুর মৃতদেহ, সেতুতে আবদ্ধ সমুদ্র ইত্যাদি দেখার পর পুনরায় সভাস্থলে ফিরে এসে সিংহাসনে উপবেশন করেছেন। এমন সময় চারদিকে কান্নার মৃদুরোল শোনা গেল। নূপুর এবং কঙ্কণের শব্দ শোনা গেল। বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ জেনে চিত্রাঙ্গদা সুন্দরী সহচরী পরিবেষ্টিতা হয়ে রাজসভায় প্রবেশ করলেন। রাবণ মহিষী এবং বীরবাহুর মাতা চিত্রাঙ্গদা দেবী শোকে মুহ্যমান। চিত্রাঙ্গদা দেবী রাজসভায় যখন প্রবেশ করলেন, তখন তার খোঁপা ছিল বন্ধনমুক্ত, কেশরাশি ছিল অবিন্যস্ত ও আলুথালু। চিত্রাঙ্গদার দেহ ছিল নিরাভরণ। তাকে দেখতে শিশির সিক্ত পুষ্পহীন লতার মতোই দেখাচ্ছিল। তার দুই চোখ ছিল শিশিরসিক্ত পদ্মপাতার ন্যায়। পুত্রশোকে চিত্রাঙ্গদা দেবী ছিলেন রীতিমতো উন্মাদিনী। বিষধর সাপ সন্তর্পণে

পাখির বাসায় ঢুকে পক্ষিশাবক গ্রাস করলে পক্ষিমাতা যেমন মর্মবেদনায় ছটফট করে, পুত্রশোকাতুরা রাজমহিষী চিত্রাঙ্গদা দেবীও তেমনি গভীর মর্মযাতনায় বুক চাপড়ে মরছিলেন। চিত্রাঙ্গদা দেবীর এ অবস্থা দেখে রাজসভার সকলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। মনে হলো যেন শোকের ঝড় প্রবাহিত হচ্ছে। এ ঝড়ে সুন্দরী মেয়েদের মনে হলো যেন বিদ্যুৎ, তাদের খোলা চুল যেন কৃষ্ণবর্ণের মেঘ, দীর্ঘ নিঃশ্বাস যেন প্রলয় বাতাস, তাদের অশ্রু যেন বৃষ্টিধারা, আর তাদের হাহাকার ধ্বনি যেন মেঘ গর্জন। কবি অসামান্য উপমার সাহায্যে রাজসভার শোকের ঝড়ের বর্ণনা দিয়েছেন আলোচ্য অংশে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

☞	নিচের রচনামূলক প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য-উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে, সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে সব প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়নি, সেগুলো নিজে লিখুন।

প্রশ্ন

১. 'সমুদ্রের প্রতি রাবণ' কবিতা অবলম্বনে রাবণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
২. 'সমুদ্রের প্রতি রাবণ' কবিতা অবলম্বনে লঙ্কাপুরীর বর্ণনা দিন।
৩. 'সমুদ্রের প্রতি রাবণ' কবিতা অবলম্বনে লঙ্কার যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা দিন।
৪. রাবণের রাজসভায় চিত্রাঙ্গদা দেবীর প্রবেশ ও সভাস্থলে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করুন।
৫. সমুদ্রকে দেখে রাবণের মানসিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করুন।

উত্তর :

প্রশ্ন : 'সমুদ্রের প্রতি রাবণ' কবিতা অবলম্বনে রাবণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

উত্তর : মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'সমুদ্রের প্রতি রাবণ' কবিতায় লঙ্কাধিপতি রাবণের চরিত্র নিপুণভাবে অঙ্কিত হয়েছে। শৌর্য-বীর্য, দেশপ্রেম সন্তান-বাৎসল্য ইত্যাদি নানাগুণে রাবণের চরিত্র উজ্জ্বল।

রাবণ দেশপ্রেমিক রাজা। দেশের প্রতি তার ভালোবাসা প্রগাঢ়। তাই পুত্রশোকে প্রথমে বিষণ্ন হয়ে পড়লেও বীরবাহুর মৃতদেহ দেখে ক্রমে তিনি গর্ববোধ করতে থাকেন। প্রকৃত বীর দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ-বিসর্জন করেন- বীরবাহুরও তা-ই করেছেন। তাই পিতা রাবণের অহঙ্কারের কোনো শেষ নেই। বীরবাহুর মৃতদেহ দেখে তাই রাবণ বলছেন-

'যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার
প্রিয়তম, বীরকুল সাধ এ শয়নে
সদা! রিপুদলবলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়; শত ধিক তারে!'

রাবণ সন্তান-বৎসল পিতা। সন্তানের জন্য তার ভালোবাসার কোনো শেষ নেই। তাই বীরবাহুর মৃত্যু তাকে গভীরভাবে ব্যথিত ও বেদনাবিদ্ধ করেছে। রণক্ষেত্রে বীরবাহুকে মৃত্যুশয্যায় শায়িত দেখে রাবণের হৃদয়ে বেদনা এবং আনন্দের মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

যে সমুদ্র ছিল লঙ্কার ঐশ্বর্যের মূল কারণ, সেই সমুদ্রই আজ রামের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে। এ দৃশ্য দেখে রাবণ দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তাই সমুদ্রকে তিনি শত ভাষায় ধিক্কার দেন। কিন্তু পরক্ষণেই দেশপ্রেমিক রাজা রাবণ সমুদ্রকে আবার সমহিমায় জাগ্রত হওয়ার আহ্বান জানান–

'উঠ, বলি, বীরবলে এ জাগল ভাঙি,
দূর কর অপবাদ; জুড়াও এ জ্বালা,
ডুবিয়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু।
রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক রেখা,
হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি।'

রাবণ বীর যোদ্ধা। যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়াবহ অবস্থা দর্শন করেও তিনি এতটুকু বিচলিত হননি। তিনি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করেছেন, কিভাবে রামের সৈন্যবাহিনীকে মোকাবিলা করা যায়। স্ত্রী চিত্রাঙ্গদার আকুল কান্নায়ও তিনি ছিলেন স্থির। সভাস্থ সকলেই যখন কান্নায় ভেঙে পড়েছেন, রাবণ তখনও অটল এবং স্থির।

রাবণ মাইকেল মধুসূদন দত্তের এক অনবদ্য সৃষ্টি মূল মহাকাব্যে রাবণের যে সব গুণ প্রকাশিত, তা আলোচ্য কবিতাংশে পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না। তবে, এখানে যে টুকু পরিচয় পাই, তাতেই রাবণকে মহাকাব্যের নায়কোচিত গুণাবলীতে আমরা ভূষিত দেখি।

প্রশ্ন : সমুদ্রকে উদ্দেশ্য করে রাবণ যে আক্ষেপ করেছেন, তা বর্ণনা করুন।

উত্তর : মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'সমুদ্রের প্রতি রাবণ' কবিতায় রামের হাতে শৃঙ্খলিত সমুদ্রের প্রতি তীব্র ক্ষোভ ও আক্ষেপ প্রকাশিত হয়েছে। আমরা নিচে রাবণের ক্ষোভ ও আক্ষেপ উপস্থাপন করছি।

দূতের মুখে রাবণ সংবাদ জেনেছেন যে, রামের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে প্রিয়পুত্র বীরবাহু নিহত হয়েছেন। বীরবাহু বীরের মতো যুদ্ধ করে বহু শত্রু-সৈন্য নিহত করে নিজে মারা গেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে বীরবাহুর মৃতদেহ পড়ে আছে শুনে রাবণ বিচলিত হয়ে পড়েন। পুত্রের মৃতদেহ দেখার জন্য রাবণ প্রাসাদ-শীর্ষে আরোহণ করেন। সেখান থেকে লঙ্কানগরী, সিংহদরজা, যুদ্ধক্ষেত্র, বীরবাহুর মৃতদেহ দেখার পর রাবণের চোখ পড়ে লঙ্কার গৌরব সুনীল সমুদ্রের দিকে। সমুদ্রের বুকে শিলার বাঁধ দেখেই রাবণ ক্ষোভে দুঃখে অভিমানে যন্ণায় আক্ষেপ করে ওঠেন এবং সমুদ্রকে ধিক্কার দিতে থাকেন।

রাবণ প্রাসাদ-শীর্ষ থেকে লক্ষ করেন, সমুদ্রের বুকে কৃষ্ণবর্ণের শিলার বাঁধ ভাসছে। বাঁধের দুই ধারে গম্ভীর শব্দ করে ঢেউ আছড়ে পড়ছে। রাজপথের মতো প্রশস্ত এ সেতু দেখে রাবণ বুঝতে পারেন যে, সমুদ্র অধম রামের বশ্যতা স্বীকার করেছে। শৃঙ্খলিত সমুদ্রকে দেখে রাবণ সমুদ্রের উদ্দেশ্যে শ্লেষ ও ধিক্কার বাণী উচ্চারণ করেছে। রাবণের ধিক্কারের মূল কথাই হলো, অজেয় সমুদ্রের এ শৃঙ্খলিত অবস্থা কিছুতেই সমুদ্রের শোভা হতে পারে না। রাবণের এ মনোভাব কবি তুলে ধরেছেন নিম্নোক্তভাবে-

কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ হা ধিক্ ওহে জলদলপতি!
এ কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য অজেয়
তুমি? হায়, এ কি হে তোমার ভূষণ,
রত্নাকর?

সমুদ্রকে উদ্দেশ্য করে রাবণ বলছেন যে, কৃষ্ণের বুকে যেমন কৌস্তুভরতন শোভা পায়, তেমনি নীল সমুদ্রের বুকে শোভা পায় লঙ্কানগরী। কাজেই সমুদ্র এবং লঙ্কানগরী একে অপরের গৌরবস্বরূপ। কিন্তু আজ সেই সমুদ্রই রামের বশ্যতা স্বীকার করেছে, নিজের অপরাজেয় সত্তাকে নিজেই বিনষ্ট করেছে। রাবণ বলছেন যে, সমুদ্র ছিল প্রচণ্ড ঝড়ের মতো শক্তিমান। তাই তিনি বিশ্বাসই করতে পারছেন না যে লঙ্কার অজেয় সমুদ্র কখনো শিলার শৃঙ্খল পরতে পারে। তিনি বলছেন, অধম ভালুককে যাদুকর শৃঙ্খল পরিয়ে খেলা দেখায়। কিন্তু সিংহকে কি কেউ শৃঙ্খল পরাতে পারে? সমুদ্র তো রাবণের কাছে সিংহের মতো শক্তিমান। তাই কি করে রাম তাকে শৃঙ্খলিত করলো, তা যেন বিশ্বাসই করতে পারছেন না রাবণ। তাই তিনি বলছেন–

কহ, এ নিগড় তবে
পর তুমি কোন পাপে? অধম ভালুকে
শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে;
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
বীতংসে?

সমুদ্রের জন্য রাবণের গর্ব ও গৌরবের কোনো শেষ নেই। সমুদ্রকে, চরম বিপর্যস্ত অবস্থাতেও, রাবণ তাই একেবারে অবিশ্বাস করতে পারছে না। তার প্রবল বিশ্বাস, সমুদ্র লঙ্কার সঙ্গে এ শত্রুতা করতে পারে না। সমুদ্র আবার স্বরূপে আবির্ভূত হবে, ভাসিয়ে দেবে রামের শিলা সেতু, ভেসে যাবে রামের সৈন্যবাহিনী, লঙ্কানগরী ফিরে পাবে তার হৃত গৌরব- এমনি আশা করছেন রাবণ। রাবণ জানেন, একমাত্র সমুদ্রই পারে তার এ আশার বাস্তবরূপ দিতে। তাই তিনি সমুদ্রকে এ বন্দীদশা থেকে মুক্ত হবার আহ্বান জানিয়েছেন, সমুদ্রকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তার অসীম শক্তির কথা। রাবণের ভাষায়-

উঠ, বলি; বীরবলে এ জাঙাল ভাঙি,
দূর কর অপবাদ ; জুড়াও এ জ্বালা,
ডুবিয়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু।
রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক রেখা,
হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি।

সমুদ্র লঙ্কার গৌরব ও ঐশ্বর্যের শ্রেষ্ঠ উৎস। সেই সমুদ্রকে শৃঙ্খলিত দেখে রাবণ ক্ষোভে ও দুঃখে ফেটে পড়েছেন, জানিয়েছেন ধিক্কার বাণী। তবে বিপর্যস্ত মুহূর্তেও সমুদ্রকে স্বরূপে জাগ্রত হবার আহ্বান জানাতে রাবণ ভোলেননি। এখানেই সমুদ্রের প্রতি তার অসীম ভালোবাসা ও বিশ্বাস প্রকাশিত হয়েছে।

ভাষা-বিষয়ক প্রশ্ন

☞	পঠিত রচনাটির কিছু ভাষা-বিষয়ক প্রশ্ন দেয়া হয়েছে। এগুলোর সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে- সেগুলো ভালভাবে পড়ুন। যেগুলো দেয়া হয়নি- সেগুলো নিজে নিজে করুন।

১. নীচের অংশগুলোর গদ্যরূপ লিখুন–

ক. এ জগৎ যেন
আনিয়া বিবিধ ধন, পূজার বিধানে,
রেখেছে, রে চারুলঙ্কে, তোর পদতলে,
জগৎ বাসনা তুই, সুখের সদন।

খ. দেখিলা রাজা নগর বাহিরে,
রিপুবৃন্দ, বালিবৃন্দ সিন্দুতীরে যথা,
নক্ষত্রমন্ডল কিম্বা আকাশ মণ্ডলে।

গ. দাশরথি পশ্চিম দুয়ারে–
হায় রে বিষণ্ন এবে জানকী বিহনে,
কৌমুদী বিহনে যথা কুমুদরঞ্জন
শশাঙ্ক।

ঘ. কহ, এ নিগড় তবে
পর তুমি কোন পাপে? অধম ভালুকে
শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে;
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
বীতংসে?

ঙ. শোকের ঝড় বহিল সভাতে।
সুর সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল; মুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন
নিঃশ্বাস প্রলয় বায়ু, অশ্রুবারি ধারা
আসার; জীমূত-মন্ত্র হাহাকার রব।

২. পৌরাণিক প্রসঙ্গ নির্দেশ করুন
গরুড়, ঘটোৎকচ, কর্ণ, জানকী, চিত্রাঙ্গদা

৩. উপমা কাকে বলে? 'সমুদ্রের প্রতি রাবণ' কবিতা থেকে তিনটি উপমা শনাক্ত করুন।

উত্তর

প্রশ্ন : পৌরানিক প্রসঙ্গ নির্দেশ করুন–

গরুড় – পুরাণবর্ণিত বিশালাকায় পাখি। বিষ্ণুর বাহন গরুড়। গরুড়ের সঙ্গে রাজা দশরথের বন্ধুত্ব ছিল বলে জানা যায়।

ঘটোৎকচ – ভীমের রাক্ষসী স্ত্রী হিড়িম্বার গর্ভজাত পুত্র। তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত হন।

কর্ণ – মহাভারতে বর্ণিত পঞ্চপাণ্ডবের মাতা কুন্তী দেবীর কুমারী অবস্থায় জাত পুত্র। কথিত আছে যে, সূর্যের ঔরসে তার জন্ম। তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অন্যায়ভাবে অর্জুনের শরাঘাতে নিহত হন।

জানকী – সীতা। জনক রাজার কন্যা বলে সীতাকে জানকী বলা হয়।

চিত্রাঙ্গদা – রাবণের মহিষী। বীরবাহুর মাতা।

প্রশ্ন : উপমা কাকে বলে? 'সমুদ্রের প্রতি রাবণ' কবিতা অবলম্বনে তিনটি উপমা শনাক্ত করুন।

উত্তর : যখন সমধর্মী দুই বস্তুর মধ্যে তুলনা করা হয়, তখন তাকে উপমা বলে। 'সমুদ্রের প্রতি রাবণ' কবিতা থেকে তিনটি উপমা নীচে প্রদত্ত হলো–

ক. বীরবাহু শোকে
বিবশা রাজমহিষী, বিহঙ্গিনী যথা,
যবে গ্রাসে কাল ফণী কুলায়ে পশিয়া
শাবকে।

খ. এ যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বুস্বামী
কৌস্তুভ রতন যথা মাধবের বুকে।

গ. বহিছে জলস্রোতঃ কলরবে,
স্রোত-পথে জল যথা বরিষার কালে।

আরও যা পড়তে পারেন

সম্ভব হলে পড়ুন- 'মেঘনাদ বধ' কাব্য। মধুসূদনের যে কোন রচনা। মধুসূদন রচনাবলীতে সব রচনাই পাওয়া যাবে। মধুসূদনের জীবনী সংগ্রহ করে পাঠ করুন।

মানব-বন্দনা

অক্ষয়কুমার বড়াল

কবি পরিচিতি

১৮৬০ সালে কলকাতার চোরবাগান অঞ্চলের ১৬ শ্রীনাথ রায় লেনের এক সুবর্ণবণিক পরিবারে অক্ষয়কুমার বড়াল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল কালীচরণ বড়াল আর জননী রাণীবালা। অক্ষয়কুমারের পিতামহ অদ্বৈতচরণ বড়ালের আদি নিবাস ছিল চন্দননগর।

কলকাতার বিখ্যাত হেয়ার স্কুলে পাঠাভ্যাস শুরু হলেও অক্ষয়কুমারের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বেশি দূর অগ্রসর হয়নি। স্কুল শিক্ষা বেশি দূর অগ্রসর না হলেও, আমৃত্যু তাঁর পাঠানুরাগ ছিল অব্যাহত। নিজ প্রচেষ্টায় তিনি অনেক বিষয় আত্ত্ব করেছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর ভাষায় তিনি যথার্থ অর্থেই একজন স্বশিক্ষিত ব্যক্তি।

পেশা হিসেবে অক্ষয়কুমার চাকুরিকে বেছে নিয়েছিলেন। স্কুল ত্যাগের কিছুকাল পরে অক্ষয়কুমার প্রথমে 'দিল্লী এ্যান্ড লন্ডন ব্যাঙ্ক' এর হিসাব বিভাগে কর্মচারিরূপে যোগ দেন। বেশ কয়েক বছর তিনি এ ব্যাঙ্কে চাকুরি করেন। কিন্তু কর্মাধ্যক্ষের সঙ্গে মনোমালিন্যের কারণে চাকুরি ছেড়ে দিয়ে তিনি 'নর্থ ব্রিটিশ লাইফ-ইনস্যুরান্স কোম্পানি'র অফিসে হিসাব সচিব পদে যোগ দেন। এ পদে চাকুরি থেকেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

হেয়ার স্কুলের ছাত্র থাকাকালীন তিনি বাংলা গীতি কবিতার প্রবর্তক বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হন। বিহারীলালের কাব্য প্রেরণাতেই তিনি কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করেন। রবীন্দ্রনাথের মতো অক্ষয়কুমার বড়ালকেও বলা হয় 'বিহারীলালের সাক্ষাৎ ভাবশিষ্য'। বাংলা গীতিকবিতার ইতিহাসে মানবতাবাদী ধারার প্রবর্তক হিসেবে অক্ষয়কুমার বড়াল বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা কাব্যের ইতিহাসে তিনি 'বড়াল কবি' নামে সুপরিচিত। বিহারীলাল চক্রবর্তী প্রবর্তিত নব্য রোম্যান্টিক গীতিকবিতার ধারাটি যাঁরা সমৃদ্ধ করেছেন, অক্ষয়কুমার বড়াল তাঁদের অন্যতম। নিসর্গ, প্রেম, শোক এবং মানববন্দনা বিষয়ক কবিতা রচনায় অক্ষয়কুমার বিশেষ স্বাতন্ত্যের পরিচয় দিয়েছেন। অক্ষয়কুমারের চিন্তাধারা ছিল মার্জিত ও বিজ্ঞানমনস্ক।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জুন যক্ষা রোগ আক্রান্ত হয়ে অক্ষয়কুমার বড়াল কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

অক্ষয়কুমার বড়ালের প্রধান প্রধান রচনা

কাব্য : প্রদীপ (১৮৮৪), কনকাঞ্জলি (১৮৮৫), ভুল (১৮৮৭), শঙ্খ(১৯১০), এষা (১৯১২)।

নাটক : চণ্ডীদাস (অসম্পূর্ণ, ১৯১৬-১৭)।

সম্পাদিত গ্রন্থ : রাজকৃষ্ণ রায়ের 'কবিতা' (১৮৮৭), গিরীন্দ্র মোহিনী দাসীর 'অশ্রুকণা' (১৮৮৭)।

ভূমিকা

"মানব-বন্দনা" অক্ষয় কুমার বড়ালের একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। তাঁর 'প্রদীপ' কাব্য থেকে কবিতাটি সঙ্কলিত হয়েছে।

"মানব-বন্দনা" কবিতায় কবি মানবজাতির আদিম অসহায় অবস্থা থেকে ধাপে ধাপে সভ্যতার উচ্চতম পর্যায়ে উপনীত হবার বিজ্ঞানসম্মত ধারাবাহিক বিবরণ উপস্থাপন করেছেন। মানবজাতির অন্তহীন উচ্চাশা, ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস এবং বিপুল কর্মকাণ্ডের পরিচয় অনুধাবন করে কবি মুগ্ধ হয়েছেন। তাই তিনি বিমুগ্ধ চিত্তে একক মানুষের সামান্য কর্মপ্রয়াস থেকে শুরু করে ঐক্যবদ্ধ মানুষের বিপুল কর্মকাণ্ডের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। আদিম অরণ্যচারী গুহাবাসী মানুষ

কোনো অলৌকিক বা দৈবশক্তির সহায়তায় উন্নতির শিখরে উপনীত হয়নি। আত্মরক্ষা এবং আত্মবিকাশের স্বার্থেই ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানুষ তা অর্জন করেছে। এ সম্মিলিত এবং ঐক্যবদ্ধ মানুষের বন্দনাগীতিই হচ্ছে অক্ষয়কুমারের 'মানব বন্দনা' কবিতা। তাই বিষয়বস্তুর বিচারে আলোচ্য কবিতাটির নাম যথোপযুক্ত হয়েছে।

ইউনিটের উদ্দেশ্য

১. মানবজাতির ক্রমবিবর্তনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পাঠ ১

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- মানুষের আদিম অবস্থার পরিচয় প্রদান করতে পারবেন।
- মানবজাতির বিবর্তনের প্রাথমিক পর্যায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রামের স্বরূপ বর্ণনা করতে পারবেন।

☞	মূলপাঠটি নীরবে ও সরবে কয়েকবার পড়ুন এবং বুঝবার চেষ্টা করুন। বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ দেয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
সেই আদি যুগে – সৃষ্টির সূচনালগ্নে। **দেবে না মানবে** – দেবতা না মানুষকে। **লুটি** – লুট করে। **ধরায়** – পৃথিবীতে। **মরুত গর্জনে** – প্রবল বাতাসের গর্জনের মধ্যে। **অন্বেষণ** – খোঁজ করা। **আরক্ত** – ঈষৎ লাল বর্ণ, রক্তিম আভা। **ভেদিয়া তিমিরে** – অন্ধকার ভেদ করে। **কর্দমে পিচ্ছিল** – পিচ্ছিল মাটি। **সলিল** – জল। **গরুড়** – পক্ষিরাজ, গরুড় হচ্ছে বিষ্ণুর বাহন। **সর্পকুল** – বহু ধরনের সাপ। **শ্বাপদ** – মাংসাশী হিংস্র জন্তু। **ব্যাদানি** – উদঘাটন করে, বিস্তার করে। **লাঙ্গুল** – লেজ। **দংশিছে** – দংশন করছে। **শ্যেন** – বাজপাখি। **লগুড়** – লাঠি বা গদা।	১ সেই আদি-যুগে যবে অসহায় নর নেত্র মেলি ভবে, চাহিয়া আকাশ পানে–কারে ডেকেছিল, দেবে না মানবে? কাতর আহ্বান সেই মেঘে মেঘে উঠি, লুটি গ্রহে গ্রহে, ফিরিয়া কি আসে নাই, না পেয়ে উত্তর, ধরায় আগ্রহে? সেই ক্ষুব্ধ অন্ধকারে, মরুত গর্জনে, কার অন্বেষণ? সে নহে বন্দনা-গীত, ভয়ার্ত-ক্ষুধার্ত খুঁজিছে স্বজন! ২ আরক্ত প্রভাত সূর্য উদিল যখন ভেদিয়া তিমিরে, ধরিত্রী অরণ্যে ভরা, কর্দমে পিচ্ছিল সলিলে শিশিরে! শাখায় ঝাপটি পাখা গরুড় চিৎকারে কাণ্ডে সর্পকুল, সম্মুখে শ্বাপদ-সংঘ বদন ব্যাদানি আছাড়ে লাঙ্গুল; দংশিছে দংশক গাত্রে, পদে সরীসৃপ শুন্যে শ্যেন উড়ে; –

শীর্ণ – কৃশকায়, ক্ষীর্ণ। **পত্রপুট** – গাছের পাতার ঠোংগা।	কে তাহারে উদ্ধারিল? দেব না মানব- প্রস্তরে লগুড়ে? ৩ শীর্ণ অবসন্ন দেহ, গতিশক্তিহীন, ক্ষুধায় অস্থির; কে দিল তুলিয়া মুখে স্বাদু পক্ব ফল, পত্রপুটে নীর? কে দিল মুছায়ে অশ্রু? কে বুলাল কর সর্বাঙ্গে আদরে? কে নব্ পল্লবে দিল রচিয়া শয়ন আপন গহ্বরে? দিল করে পুষ্পগুচ্ছ, শিরে পুষ্পলতা, অতিথি সৎকার! নিশীথে বিচিত্র সুরে বিচিত্র ভাষায় স্বপন সম্ভার!

ভাবসংক্ষেপ

সৃষ্টির সূচনালগ্নে মানুষ ছিল চরমভাবে অসহায়। তার কোনো বন্ধু বা স্বজন ছিল না। অসহায় নিঃসঙ্গ মানুষ বিপদের সময় কাতর ক্রন্দনে আকাশ-বাতাস মুখরিত করলেও, তার কান্না সেদিন দেবতার মন টলাতে পারেনি। দেবতা বা অন্য কোনো অতিলৌকিক শক্তি নয়, অসহায় ভয়ার্ত মানুষ সেদিন সাহায্যের প্রত্যাশায় তার স্বজাতিকেই খুঁজে বেড়িয়েছে, ক্ষুধার অন্ত্রের জন্য সে অন্য মানুষের কাছেই হাত পেতেছে।

সৃষ্টির আদি লগ্নে পৃথিবী অরণ্য, জলাভূমি ও কাদায় পূর্ণ ছিল। আদিকালে মানুষের সামনে সব সময় বিপদ এসে দেখা দিত। হিংস্র পাখি ও জীব-জন্তু এবং বিষধর সাপ সানুষকে আক্রমণ করতো। ওইসব হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে মানুষ দেবতার সাহায্য চায়নি, দেবতারাও নিজে এসে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি। সেই ভয়ঙ্কর বিপদের দিনে লাঠি ও প্রস্তর খণ্ডের সাহায্যে এক মানুষই অন্য মানুষকে রক্ষা করেছে।

ক্ষুধার সময় মানুষ যখন অস্থির তখন দেবতা নয় বরং এক মানুষই অন্য মানুষকে খাবার দিয়েছে, নিবারণ করেছে তার ক্ষুৎপিপাসা। আদিকালে শোকে যন্ণায় বিদ্ধ মানুষকে সান্ত্বনা আর শুশ্রূষা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে মানুষই, অন্য কেউ নয়। আদি মানুষের আরাম আয়েশের উপকরণও যুগিয়েছে আদি মানুষ। মানুষ মানুষের বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছে। মানুষ পত্র পুষ্পেনিজেদের সুশোভিত করেছে এবং বিচিত্র ভাষায় ও গানে ভবিষ্যতের সুখ-স্বপ্ন রচনা করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

প্রশ্ন

১. আদি যুগে পৃথিবীর অবস্থা কেমন ছিল?
২. আদি যুগে অসহায় মানুষ কি ধরনের বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল?
৩. আদি যুগে মানুষ কার আশ্রয় প্রার্থনা করেছিল এবং কেন?
৪. 'সে নহে বন্দনা-গীত, ভয়ার্ত ক্ষুধার্ত/খুঁজিছে স্বজন' এখানে ভয়ার্ত ক্ষুধার্ত বলতে কাদের বুঝানো হয়েছে? কে কোন স্বজনকে খুঁজেছে?

৫. আদি মানুষ একে অপরকে কীভাবে সাহায্য করেছে?
৬. আদি মানুষ কীভাবে স্বপ্নের বীজ বপন করেছে?

প্রশ্ন : আদি যুগে অসহায় মানুষ কি ধরনের বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল?

উত্তর : আদি যুগের মানুষ ছিল অসহায় ও নিঃসঙ্গ। মানুষের চারধারে ছিল নানা ধরনের বিপদের উপাদান। ভয়ঙ্কর অন্ধকার আর মেঘগর্জনের প্রেক্ষাপটে শুরু হয়েছিল মানুষের প্রথম লগ্ন। পৃথিবীর চারদিকেই ছিল বিশাল অরণ্য, বিস্তৃত জলাভূমি আর থৈ-থৈ কাদা। হিংস্র পাখি আর সাপ ছিল মানুষের নিত্য দিনের বিপদের উৎস। হিংস্র শ্বাপদরা লেজ আছড়িয়ে আক্রমণে উদ্যত। হিংস্র বাজপাখি আর সরীসৃপের ভীতিও মানুষকে প্রতি পদে শঙ্কিত রাখতো। এ সব বিপদ থেকে উদ্ধারের কোনো পথ সেদিনের মানুষের জানা ছিল না। কিন্তু পরস্পর সহযোগিতার মাধ্যমে অতি সহজেই মানুষ এ-সব বিপদ থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পেরেছে।

প্রশ্ন : আদি যুগে মানুষ কার আশ্রয় প্রার্থনা করেছিল এবং কেন?

উত্তর : সৃষ্টির সূচনালগ্নে মানুষ ছিল চরমভাবে অসহায়। তার কোনো বন্ধু বা স্বজন ছিল না। প্রকৃতির নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতা থেকে বাঁচার জন্যে আদি মানুষ গগনবিদারী আর্তনাদ করেছে। মানুষের সে আর্তনাদ মেঘ বেয়ে ঊর্ধ্বলোকে উঠেছিল এবং অসীম শূন্যতার মাঝে মাথা ঠুকে মরেছিল। সেদিন মানুষের আর্ত-আহাজারি দেবতার কর্ণকুহরে প্রবেশ করেনি। দেবতার সাহায্য বঞ্চিত মানুষ তখন নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে, একের বিপদে অন্যকে আহ্বান করেছে। মানুষের সাহায্যে সেদিন মানুষই এগিয়ে এসেছিল– পরস্পর সহযোগিতার মাধ্যমে তারা বিপদ মোকাবিলা করেছে, প্রতিকূলতাকে জয় করেছে। এভাবে দেখা যায়, আদি যুগের মানুষ মানুষেরই সাহায্য ও আশ্রয় কামনা করেছে।

প্রশ্ন : আদি মানুষ একে অপরকে কীভাবে সাহায্য করেছে?

উত্তর : আদি যুগের মানুষ ছিল অসহায় ও নিঃসঙ্গ। তার কোনো বন্ধু বা স্বজন ছিল না। প্রকৃতির নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতা থেকে বাঁচার জন্যে আদি মানুষ গগনবিদারী আর্তনাদ করেছে। মানুষের সে আর্তনাদ মেঘ বেয়ে ঊর্ধ্বলোকে উঠেছিল। কিন্তু তার সাহায্যের জন্য সেদিন কোন দেবতা এগিয়ে আসেনি। বরং মানুষই সেদিন মানুষের সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়। দেবতার সাহায্য বঞ্চিত মানুষ সেদিন নিজেদের পায়ে দাঁড়ানর চেষ্টা করেছে, একের বিপদে অন্যকে আহ্বান করেছে। হিংস্র পাখি ও পশুর আক্রমণের সময় এক মানুষ অন্যকে সাহায্য করেছে। ক্ষুধার সময় মানুষের মুখে খাবার তুলে দিয়েছে মানুষ, শোক ও বেদনায় এক মানুষ অন্যকে শুশ্রূষা দিয়েছে, কখনো বা নিজের ঘরে অন্যের আশ্রয়ের জন্য সাজিয়ে দিয়েছে পাতার শয্যা। এভাবে মানুষের সাহায্যের জন্য সেদিন মানুষই এগিয়ে এসেছিল পরস্পর-সহযোগিতার মাধ্যমে তারা বিপদ মোকাবিলা করেছে, প্রতিকূলতাকে জয় করেছে।

প্রশ্ন : 'সে নহে বন্দনা গীত, ভয়ার্ত ক্ষুধার্ত/খুঁজিছে স্বজন' – এখানে ভয়ার্ত,ক্ষুধার্ত বলতে কাদের বুঝানো হয়েছে? সে কোন স্বজনকে খুঁজেছে?

উত্তর : আদি যুগের মানুষ ছিল অসহায় ও নিঃসঙ্গ। মানুষের চারদিকে ছিল নানা ধরনের বিপদের উৎস। ভয়ঙ্কর অন্ধকার আর মেঘ গর্জনের প্রেক্ষাপটে শুরু হয়েছিল মানুষের প্রথম যাত্রা। আলোচ্য চরণে এ আদি মানুষকেই বলা হয়েছে ভয়ার্ত ক্ষুধার্ত জন। আদি মানুষ বিভিন্ন বিপদ থেকে মুক্তির জন্য দেবতার সাহায্য কামনা করেনি বরং তারা স্বজনকেই খুঁজেছে। এক মানুষ অন্য মানুষকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছে, একের বিপদে অন্যজন এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। উদ্ধৃত কবিতাংশে সে কথাই বলতে চেয়েছেন কবি।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. সেই আদি-যুগে যবে অসহায় নর
নেত্র মেলি ভবে,
চাহিয়া আকাশ পানে– কারে ডেকেছিল,
দেবে না মানবে?
২. সেই ক্ষুব্ধ অন্ধকারে, মরুত গর্জনে
কার অন্বেষণ?
সে নহে বন্দনা-গীত, ভয়ার্ত ক্ষুধার্ত
খুঁজিছে স্বজন!
৩. দংশিছে দংশক গাত্রে, পদে সরীসৃপ
শূন্যে শ্যেন উড়ে; –
কে তাহারে উদ্ধারিল? দেব না মানব
প্রস্তরে লগুড়ে?
৪. কে দিল মুছায়ে অশ্রু? কে বুলাল কর
সর্বাঙ্গে আদরে?
কে নব পল্লবে দিল রচিয়া শয়ন
আপন গহ্বরে?
৫. দিল করে পুষ্পগুচ্ছ, শিরে পুষ্পলতা
অতিথি সৎকার!
নিশীথে বিচিত্র সুরে বিচিত্র ভাষায়
স্বপন সম্ভার!!

উত্তর :

২। সেই ক্ষুব্ধ অন্ধকারে, মরুত গর্জনে
কার অন্বেষণ?
সে নহে বন্দনা-গীত, ভয়ার্ত-ক্ষুধার্ত
খুঁজিছে স্বজন!

আলোচ্য অংশটুকু কবি অক্ষয়কুমার বড়াল বিরচিত 'মানব-বন্দনা' শীর্ষক কবিতা থেকে উৎকলিত হয়েছে। এখানে আদি যুগের মানুষের চরম অসহায়তা এবং পরস্পর সাহায্য প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে।

আদি-যুগের মানুষ ছিল অসহায় ও নিঃসঙ্গ। তার কোনো বন্ধু বা স্বজন ছিল না। প্রকৃতির নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতা থেকে বাঁচার জন্যে আদি মানুষ গগনবিদারী আর্তনাদ করেছে। মানুষের সে আর্তনাদ মেঘ বেয়ে ঊর্ধ্বলোকে উঠেছিল। কিন্তু তার সাহায্যের জন্য সেদিন কোনো দেবতা এগিয়ে আসেনি। বরং মানুষই সেদিন মানুষের সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়। দেবতার সাহায্য বঞ্চিত মানুষ সেদিন নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে, একের বিপদের অন্যকে আহ্বান করেছে। ভয়ঙ্কর বিপদের সময়, গভীর অন্ধকার আর কর্ণবিদারী মেঘ গর্জনের সময় মানুষ দেবতার অন্বেষণ করেনি, বরং সে খুঁজেছে তার পরম স্বজন মানুষকেই। আলোচ্য অংশে মানুষের সে পরস্পর সহযোগিতার কথাই বলা হয়েছে।

৩। দংশিছে দংশক গাত্রে, পদে সরীসৃপ
শূন্যে শ্যেন উড়ে; –
কে তাহারে উদ্ধারিল ? দেব না মানব
প্রস্তরে লগুড়ে?

আলোচ্য অংশটুকু কবি অক্ষয়কুমার বড়াল বিরচিত 'মানব-বন্দনা শীর্ষক কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে আদি মানুষের চরম অসহায়তা এবং ভয়ঙ্কর বিপদের কথা বলা হয়েছে।

আদি যুগের মানুষ ছিল অসহায় ও নিঃসঙ্গ। তার কোনো বন্ধু বা স্বজন ছিল না। সমস্ত পৃথিবী ছিল ঘন বন-জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন। চারদিকে জলাভূমি আর থৈ থৈ কাদা। মানুষের জীবন নানা হিংস্র পাখি ও জীবজন্তুতে বিপদাপন্ন হয়ে উঠেছিল। মাটিতে হিংস্র জন্তুর হুঙ্কার, বৃক্ষশাখায় বিষধর সাপের উদ্যত ফণা এবং পায়ের তলায় ভয়ঙ্কর সরীসৃপের চলাফেরা মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত ও শঙ্কিত করে তুলেছিল। এ বিপদের দিনে বিষাক্ত দংশকগুলো মানুষের শরীরে হুল ফোটাতো, সরীসৃপগুলো মানুষের পায়ে কামড় দিতো, মানুষের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যেত হিংস্র পাখিরা – মানুষকে হত্যা করাই যেন অন্য সব জীবজন্তুর একমাত্র লক্ষ্য। এ বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে মানুষকে উদ্ধার করার জন্য সেদিন কোনো দেবতা বা অদৃশ্য শক্তি এগিয়ে আসেনি। বরং মানুষই সেদিন এগিয়ে এসেছিল মানুষকে সাহায্য করার জন্য। সেদিন মানুষই পাথর ও লাঠির সাহায্যে হিংস্র জন্তু জানোয়ারকে পরাস্ত করে নিজেদের রক্ষা করেছে, এগিয়ে গেছে উন্নতির দিকে।

দিল করে পুষ্পগুচ্ছ, শিরে পুষ্পলতা
অতিথি সৎকার!
নিশীথে বিচিত্র সুরে বিচিত্র ভাষায়
স্বপন সম্ভার!!

আলোচ্য অংশটুকু কবি অক্ষয়কুমার বড়াল বিরচিত 'মানব-বন্দনা' শীর্ষক কবিতা থেকে উৎকলিত হয়েছে। এখানে আদি মানুষের চরম বিপদের দিনেও জীবনের আনন্দের ছবি অঙ্কিত হয়েছে।

আদি যুগের মানুষ ছিল অসহায় ও নিঃসঙ্গ। তার কোনো বন্ধু বা স্বজন ছিল না। চরম অসহায়তার দিনে সাহায্যের জন্য মানুষ তীব্র আর্তনাদ করেছে। কিন্তু সেদিন তাদের সাহায্য করার জন্য কোনো দেবতা বা অদৃশ্য শক্তি মানুষকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেনি। মানুষই মানুষকে সাহায্য করেছে। পাথর ও লাঠির সাহায্যে হিংস্র জন্তু জানোয়ারকে পরাভূত করে মানুষ তার অস্তিত্ব রক্ষা করেছে। এক মানুষ অন্য মানুষকে খাবার দিয়েছে, বিশ্রামের জন্য পাতার শয্যা রচনা করে দিয়েছে। মানুষের অস্তিত্ব যখন সামান্য সময়ের জন্য বিপদমুক্ত হয়েছে, তখনই তারা আনন্দে মেতে উঠেছে। এক মানুষ অন্য মানুষের হাতে দিয়েছে ফুলের গুচ্ছ, মাথায় দিয়েছে ফুলের লতা, রাত্রিবেলা বিচিত্র সুরে গান গেয়েছে । এভাবেই তারা বিপদের দিনেও আনন্দ উপভোগের চেষ্টা করেছে। এ আনন্দ উদযাপনের মাঝে আদি মানুষ নানা স্বপ্ন দেখেছে, সেই স্বপ্নই তাদের ভবিষ্যৎ সংগ্রামের শক্তি সঞ্চার করেছে।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- মানব সভ্যতা বিকাশের স্তরসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- শৈশবে বা প্রথম অবস্থায় মানবসভ্যতা কিরূপ বিকাশলাভ করেছিল, তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কৈশোরে মানব সভ্যতা বিকাশের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- যৌবনে মানবের বিকাশধারা উল্লেখ করতে পারবেন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
শিকার-সন্ধান – আদি মানুষ খাবার হিসেবে পশু পাখি শিকার করতো। পশু-পাখির কাঁচা মাংসই ছিল আদি মানুষের খাবার। **ধনুর্বেদ** – যুদ্ধাস্ত্র বিষয়ক প্রাচীন শাস্ত্র। **বহিত্র** – নৌকা, জলযান। **কাষ্ঠে কাষ্ঠে অগ্নি জ্বালি** – প্রাচীন কালে কাঠে কাঠ ঘষে বা পাথরে পাথর ঘষে আগুন জ্বালানো হতো। **কুর্দন-নর্তন** – লাফালাফি। **চন্দ্র-সূর্য মেঘে দেব-দেবী নাম** – আদিম মানুষ বিভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তুর মধ্যে দৈবত্ব আরোপ করে তাদের পূজা করতো। আদি মানুষের কাছে এ-কারণে চন্দ্র সূর্য মেঘ বাতাস অগ্নি বৃক্ষ পূজিত ও নন্দিত হয়েছিল। **মৃত্তিকা কর্ষণে হইনু বাহির** – মানবসভ্যতার কৈশোর কালে মানুষ চাষ করতে শিখেছিল। সায়াহ্নে – সন্ধ্যাবেলা। **অগ্নি সাক্ষী করি** – প্রাচীন বৈদিক বিয়ের সময় অগ্নি বা ব্রহ্মাকে সাক্ষী মানা হতো। বিয়ের মাধ্যমেই পারিবারিক জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল। সেকথাই এখানে বলা হয়েছে। **প্রলেপন** – প্রলেপ বা মলম। **সোম** – বেদে উল্লেখিত লতা বিশেষ। এ লতার রস উত্তেজক পানীয়। **প্রাসাদ** – ভবন, দালান। **ঋক্** – বেদমন্ত্র, ঋগ্বেদ। **সাম** – পদ্যময় দ্বিতীয় বেদ। **যজুঃ** – যজু নামের বেদ। **চরক** – প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত ঋষি। **সুশ্রুত** – সুশ্রু প্রণীত বিখ্যাত চিকিৎসা গ্রন্থ। **সংহিতা** – ধর্মশাস্ত্র। **পঞ্চভূত** – ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। **হরি** – ঈশ্বর। **ভুঞ্জিতে** – ভোগ করতে। **মথুরা** – কৃষ্ণের লীলাভূমি।	**৪** শৈশবে কাহার সাথে জলে স্থলে ভ্রমি শিকার-সন্ধান? কে শিখাল ধনুর্বেদ, বহিত্র চালনা, চর্ম পরিধান? অর্ধদগ্ধ মৃগমাংস কার সাথে বসি' করিনু ভক্ষণ? কাষ্ঠে অগ্নি জ্বালি কার হস্ত ধরি কুর্দন নর্তন? কে শিখাল শিলাস্তূপে, অশ্বত্থের মূলে করিতে প্রণাম? কে শিখাল ঋতুভেদ, চন্দ্র-সূর্য মেঘে দেব-দেবী নাম? **৫** কৈশোরে কাহার সনে মৃত্তিকা কর্ষণে হইনু বাহির? মধ্যাহ্নে কে দিল পাত্রে শালি অন্ন ঢালি' দধি-দুগ্ধ-ক্ষীর? সায়াহ্নে কুটিরদ্বারে কার কণ্ঠ সাথে নির্বিদ উচ্চারি? কার আশীর্বাদ লয়ে অগ্নি সাক্ষী করি' হইনু সংসারী? কে দিল ঔষধি রোগে, ক্ষতে প্রলেপন- স্নেহে অনুরাগে? কার ছন্দে-সোম গন্ধে-ইন্দ্র অগ্নি বায়ু দিল যজ্ঞ ভাগে? **৬** যৌবনে সাহায্য কার নগর পত্তন, প্রাসাদ নির্মাণ? কার ঋক সাম যজুঃ চরক সুশ্রুত, সংহিতা পুরাণ কে গঠিল দুর্গ, সেতু পরিখা, প্রণালী, পথ, ঘাট, মাঠ? কে আজ পৃথিবীরাজ– জলে স্থলে ব্যোমে কার রাজ্য পাঠ? পঞ্চভুত প্রকৃতি উন্নীত কার জ্ঞান বলে? ভুঞ্জিতে কাহার রাজ্য–জন্মিলেন হরি মথুরা কৌশলে?

কৌশলে – কুশল বা অযোধ্যা।	

ভাবসংক্ষেপ

মানবসভ্যতার শৈশবকালে মানুষ সংঘবদ্ধভাবে শিকারের সন্ধানে বের হতো। মানুষ তাদের অস্তিত্বের প্রয়োজনে ধনুক চালনা, নৌকা চালনা, চামড়ার পোশাক পরিধান এবং কাঠে-কাঠে ঘষে আগুন জ্বালানর কৌশল আবিষ্কার করেছে। কোনো দেবতা বা অদৃশ্য কোনো শক্তি মানুষকে এ সব কৌশল আবিষ্কারে কোনো সহায়তা করেনি। বরং মানুষ নিজেরাই নিজেদের প্রয়োজনে এসব শিখে নিয়েছে। আগুনে পশুর মাংস অর্ধ-দগ্ধ করে খাওয়ার কৌশলও মানুষ আবিষ্কার করেছে। অস্তিত্বের ভীতি যখন সামান্য দূর হয়েছে তখন মানুষ সম্মিলিতভাবে আনন্দ উৎসব ও নাচ গানে মেতে উঠেছে। এ সময়ই মানুষ তার অস্তিত্বের প্রয়োজনে যখন বিশাল পাথর, কখনো অশ্বত্থ মূলে পূজা দেয়া আরম্ভ করেছে। ক্রমে মানুষ ঋতুভেদ শিখল, চন্দ্র সূর্যের পার্থক্য বুঝলো এবং বিভিন্ন জিনিসের নাম দেয়া আরম্ভ করলো।

সভ্যতার কৈশোরকালে মানুষ কৃষিকাজ আয়ত্ত করেছে। মানুষ সম্মিলিত ভাবে কৃষিকাজে বের হতো, মধ্যাহ্নে একসঙ্গে বসে আহার করতো। সন্ধ্যা বেলা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র উচ্চারণ করেছে। এরপর শুরু হলো মানুষের পরিবার জীবন, মানবসভ্যতায় আসলো নতুন মাত্রা। অগ্নি বা ব্রহ্মাকে সাক্ষী রেখে বিয়ে করে মানুষ রচনা করেছে পরিরার জীবন। এরপর মানুষ নিজেরাই রোগের ঔষধ আবিষ্কার করেছে, স্নেহ ও শুশ্রূষা দিয়ে পরস্পর পরস্পরকে সুস্থ করে তুলেছে আর সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় পূজা ও যজ্ঞে মেতে উঠেছে।

সভ্যতার যৌবন পর্যায়ে মানুষ নগর প্রতিষ্ঠা করেছে। দুর্গ, সেতু, পরিখা, প্রণালী, পথ, ঘাট তৈরি করে মানুষ তার সভ্যতাকে ক্রমেই উন্নত করে তুলেছে। দর্শন ও জ্ঞান বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব প্রসার এবং প্রকৃতি ও পঞ্চভূতকে নিয়ন্ণ করে মানুষ আস্তে-আস্তে উন্নতির স্বর্ণ-শিখরে আরোহণ করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

প্রশ্ন

১. মানবসভ্যতা বিকাশের প্রথম তিনটি স্তর কীকি?
২. শৈশবে বা প্রথম অবস্থায় মানবসভ্যতা কীভাবে বিকশিত হয়েছিল?
৩. কৈশোরে মানবসভ্যতা কীভাবে বিকশিত হয়েছিল
৪. যৌবনে মানবের বিকাশধারার পরিচয় দিন।
৫. মানুষের পরিবারপ্রথা কখন ও কীভাবে আরম্ভ হয়?
৬. আদিম মানুষ কীভাবে ধর্মীয় বিধান পালন করতো?

প্রশ্ন : শৈশবে বা প্রথম অবস্থায় মানবসভ্যতা কীভাবে বিকাশ লাভ করেছিল?

উত্তর : মানবসভ্যতা বিকাশের প্রথম স্তরকে কবি শৈশবকাল বলে অভিহিত করেছেন। শৈশবকালে আহারের উদ্দেশ্যে মানুষ সঙ্ঘবদ্ধভাবে শিকারের সন্ধানে বের হতো। মানুষ তাদের অস্তিত্বের প্রয়োজনে ধনুক চালনা, নৌকা চালনা, চামড়ার পোশাক পরিধান এবং কাঠে-কাঠে ঘষে আগুন জ্বালানোর কৌশল আবিষ্কার করেছে। কোনো দেবতা বা অদৃশ্য শক্তি মানুষকে এসব কৌশল আবিষ্কারে কোনো সহায়তা করেনি। বরং মানুষ নিজেরাই নিজেদের প্রয়োজনে এসব শিখে নিয়েছে। সভ্যতার এ শৈশব লগ্নেই আগুনে পশুর মাংস অর্ধ দগ্ধ করে খাওয়ার কৌশল মানুষ আবিষ্কার করেছে। সভ্যতার প্রথম লগ্নে অস্তিত্বের ভীতি যখন সামান্য দূর হয়েছে, তখন মানুষ সম্মিলিত ভাবে আনন্দ উৎসব ও নাচে গানে মেতে উঠেছে। সভ্যতার শৈশব পর্যায়ে মানুষ তার অস্তিত্বের প্রয়োজনে কখনো বিশাল পাথর, কখনো বা অশ্বত্থ মূলে পূজা দেয়া আরম্ভ করেছে। এ সময়ই মানুষ ঋতুভেদ শিখল, চন্দ্র সূর্যের পার্থক্য বুঝলো এবং বিভিন্ন জিনিস ও জীব জন্তুর নাম দেয়া আরম্ভ করলো।

প্রশ্ন : কৈশোরে মানবসভ্যতা কীভাবে বিকশিত হয়েছিল?

উত্তর : মানবসভ্যতা বিকাশের দ্বিতীয় স্তরকে কবি কৈশোর কাল বলে আখ্যায়িত করেছেন। সভ্যতার এ পর্যায়ে মানুষ কৃষিকাজ আরম্ভ করে। মানুষ সম্মিলিতভাবে কৃষিকাজে বের হতো, মধ্যাহ্নে এক সঙ্গে বসে আহার করতো। ক্রমে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরচিন্তা জাগ্রত হয়েছে। সন্ধ্যাকালে ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র উচ্চারণ করেছে। সভ্যতার দ্বিতীয় তথা কৈশোর স্তরেই শুরু হয় মানুষের পরিবার জীবন তথা সংসার জীবন। পরিবার জীবন বিকাশের ফলে মানবসভ্যতায় আসলো নতুন মাত্রা। এ পর্যায়ে মানুষের মধ্যে ঈশ্বর বা ধর্মবিশ্বাস প্রবল হতে থাকে। অগ্নি বা ব্রহ্মাকে সাক্ষী রেখে মানুষ বিয়ে তথা পরিবার জীবনে প্রবেশ করেছে। সভ্যতার এ পর্যায়েই মানুষ শিখে নেয় প্রাকৃতিক চিকিৎসা পদ্ধতি, নিজেরাই আবিষ্কার করে নেয় রোগের ঔষধ। সুস্থ আর সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় এ সময় মানুষ পূজা ও যজ্ঞে মেতে উঠেছে।

প্রশ্ন : যৌবনে মানবের বিকাশধারার পরিচয় দিন।

উত্তর : মানবসভ্যতা বিকাশের তৃতীয় স্তরকে কবি যৌবন কাল বলে আখ্যায়িত করেছেন। সভ্যতার এ পর্যায়ে এসে মানুষ নগর প্রতিষ্ঠা করেছে এবং দালান কোঠা নির্মাণ করেছে। মানুষ দুর্গ, সেতু, পরিখা, প্রণালী, পথ, ঘাট ইত্যাদি তৈরি করে সভ্যতাকে আরও উন্নতির পথে নিয়ে গেছে। এ পর্যায়ে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির জগতেও ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। দর্শন ও জ্ঞান বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব প্রসার এবং প্রকৃতি ও পঞ্চভূতকে নিয়ন্ণ করে মানুষ আস্তে আস্তে উন্নতির স্বর্ণশিখরে আরোহণ করেছে। এ-সময় মানুষ ঋক, সাম, যজুঃ, চরক, সুশ্রুত, সংহিতা, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ ও চিকিৎসাশাস্ত্রের বই রচনা করতে আরম্ভ করে। এভাবে মানুষের জ্ঞানলোকের অসীমতা প্রকাশ পেতে থাকে। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে প্রতিষ্ঠিত হয় মানুষের একচ্ছত্র প্রভুত্ব। এভাবেই, সভ্যতার যৌবন পর্যায়ে মানুষের ক্রমাগত প্রচেষ্টার ফলে নতুন নতুন মাত্রা সঞ্চারিত হতে থাকে।

প্রশ্ন : আদি মানুষ কীভাবে ধর্মীয় বিধান পালন করতো?

উত্তর : আদি মানুষ তাদের অস্তিত্বের প্রয়োজনে আস্তে আস্তে তৃতীয় শক্তির ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে থাকে। প্রকৃতির নানা উপাদানকে পূজা দেয়ার মাধ্যএে শুরু হয় আদি মানুষের ধর্ম পালন। বড় বড় শিলাখণ্ড, বিশাল বৃক্ষ বা অনুরূপ কোনো পদার্থ বা বস্তুকে পূজা দিতে আরম্ভ করে। এ সময় মানুষ বিভিন্ন দেব-দেবী ও অন্যান্য জিনিসের নাম দিতে আরম্ভ করে। সভ্যতার কৈশোরকালে সন্ধ্যাবেলা কুটির দ্বারে এসে মানুষ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র উচ্চারণ করেছে, অগ্নি বা ব্রহ্মাকে সাক্ষী রেখে বিয়ে করে সংসার জীবন রচনা করেছে। সভ্যতার যৌবন পর্যায়ে মানুষ বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ও প্রয়োজনীয় বই রচনা করতে আরম্ভ করে। এভাবেই রচিত হয় ঋক, সাম, যজুঃ, চরক, সুশ্রুত, সংহিতা, পুরাণ – প্রভৃতি গ্রন্থ। এ সময় থেকেই মর্ত্যলোকে বিভিন্ন অবতারের আবির্ভাব বিষয়ে মানুষের চিন্তা ভাবনা ও বিশ্বাসের পরিচয় প্রকাশিত হতে থাকে। এভাবেই আদি মানুষ বিকাশের নানা স্তরে ধর্মীয় নিয়ম কানুন প্রতিষ্ঠা ও তা পালনের চেষ্টা করেছে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. কে শিখাল শিলাস্তূপে, অশ্বত্থের মূলে?
করিতে প্রণাম?
কে শিখাল ঋতুভেদ, চন্দ্র-সূর্য মেঘে
দেব-দেবী নাম?

২. কৈশোরে কাহার সনে মৃত্তিকা কর্ষণে
হইনু বাহির?
মধ্যাহ্নে কে দিল পাত্রে শালি অন্ন ঢালি'
দধি-দুগ্ধ ক্ষীর?

৩. কে দিল ঔষধি রোগে, ক্ষতে প্রলেপন
স্নেহে অনুরাগে?
কার ছন্দে-সোম গন্ধে–ইন্দ্র অগ্নি বায়ু
দিল যজ্ঞ ভাগে?

৪. যৌবনে সাহায্য কার নগর পত্তন,
প্রাসাদ নির্মাণ?
কার ঋক সাম যজুঃ চরক সুশ্রুত,
সংহিতা পুরাণ।

৫. পঞ্চভূত প্রকৃতি উন্নীত
কার জ্ঞান বলে
ভুঞ্জিতে কাহার রাজ্য – জন্মিলেন হরি
মথুরা কৌশলে?

উত্তর

২। কৈশোরে কাহার সনে মৃত্তিকা কর্ষণে
হইনু বাহির?
মধ্যাহ্নে কে দিল পাত্রে শালি অন্ন ঢালি'
দধি-দুগ্ধ ক্ষীর?

আলোচ্য অংশটুকু কবি অক্ষয়কুমার বড়াল রচিত 'মানব-বন্দনা' শীর্ষক কবিতা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে সভ্যতার দ্বিতীয় স্তর তথা কৈশোরে কীভাবে কৃষি সভ্যতা বিকাশ লাভ করে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।
আদি মানুষ নিজেদের প্রয়োজনেই একটার পর একটা আবিষ্কার দিয়ে সভ্যতার উন্নতির দিকে এগিয়ে গেছে। এ ব্যাপারে তাকে কেউ সাহায্য করেনি– না দেবতা, না অদৃশ্য কোনো শক্তি। আদি মানুষ যেমন শিকারের কৌশল নিজেরা আবিষ্কার করেছে, যেমন আগুন জ্বালানর কৌশল নিজেরা বের করেছে, তেমনি কৃষিকাজের কৌশলও তারা নিজেরা শিখেছে। শৈশবে অর্থাৎ সভ্যতা বিকাশের দ্বিতীয় পর্যায়ে মানুষ সম্মিলিতভাবে চাষ উপযোগী অঞ্চলে সকালে চলে যেত, সকলে মিলে মাটি কর্ষণ করতো। মধ্যাহ্নে চাষ শেষ করে তারা ঘরে ফিরতো। তখন সকলে মিলে দুপুরের খাবার খেত। উদ্ধৃত অংশে কবি এ কথাই বলতে চেয়েছেন।

৪। **যৌবনে সাহায্য কার নগর পত্তন,**
প্রাসাদ নির্মাণ?
কার ঋক সাম যজুঃ চরক সুশ্রুত,
সংহিতা পুরাণ।

আলোচ্য অংশটুকু কবি অক্ষয়কুমার দত্ত বিরচিত 'মানব-বন্দনা' শীর্ষক কবিতা থেকে গৃহীত হয়েছে। এখানে সভ্যতার তৃতীয় স্তর তথা যৌবন পর্যায়ে কীভাবে সভ্যতা গড়ে ওঠে, তা বর্ণিত হয়েছে।
আদি মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে একটার পর একটা আবিষ্কার দিয়ে সভ্যতার উৎকর্ষের দিকে ক্রমাগত এগিয়ে গেছে। এ ব্যাপারে তাকে কেউ সাহায্য করেনি– না দেবতা, না অদৃশ্য কোনো শক্তি। পশু শিকার, আগুন জ্বালান, কৃষিকাজের কৌশল – প্রভৃতি বিষয় আদি মানুষ যেমন নিজেরাই আবিষ্কার করেছে, তেমনি তারাই নগর প্রতিষ্ঠা করেছে, নির্মাণ করেছে বিশাল বিমাল প্রাসাদ। নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যে এ সময় তারা ঋক, সাম, যজুঃ,

চরক, সুশ্রুত, সংহিতা, পুরাণ ইত্যাদি ধর্মীয় এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের বই রচনা করেছে। নগর প্রতিষ্ঠা এবং গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে আদি সভ্যতায় সঞ্চারিত হয় নবতর মাত্রা।

৫। **পঞ্চভূত প্রকৃতি উন্নীত**
কার জ্ঞান বলে?
ভুঞ্জিতে কাহার রাজ্য – জন্মিলে হরি
মথুরা কৌশলে?

আলোচ্য অংশটুকু কবি অক্ষয়কুমার দত্ত বিরচিত 'মানব-বন্দনা' শীর্ষক কবিতা থেকে সংগৃহীত হয়েছে। মানুষ নিজ জ্ঞানবুদ্ধির ফলে কীভাবে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা ও হিংস্র জীবজন্তুর আক্রমণ প্রতিহত করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে, ব্যাখ্যেয় অংশে তা-ই বর্ণিত হয়েছে।

ভারতীয় পুরাণের মতে পৃথিবীর পঞ্চভূত অর্থাৎ পানি মাটি আগুন বায়ু এবং আকাশ এ পঞ্চ উপাদানে গঠিত। সৃষ্টির প্রারম্ভে এসব উপাদান মানুষের সঙ্গে চরম শত্রুতা করেছে। মানুষ আপন বুদ্ধি ও কর্ম প্রচেষ্টার সাহায্যে এসব উপাদানকে নিজের নিয়ন্ত্রণে এনেছে এবং নিজেদের কল্যাণে লাগিয়েছে। বিরুদ্ধ প্রকৃতির যাবতীয় উপাদানকে নিজেদের কাজে লাগিয়ে মানুষ অভাবনীয় কল্যাণ সাধন করেছে এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছে। এ সময় মানুষ অধ্যাত্মবিশ্বাসে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। পৃথিবীতে অপশক্তিকে বিনাশ করার জন্য অবতারদের আবির্ভাব ঘটতে থাকে। এভাবেই মথুরা ও কৌশলে কৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটেছে। অসুর শক্তিকে বিনাশ করে অবতারনা মানুষের অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আলোচ্য অংশে কবি মানব সভ্যতার এ বিশেষ বিকাশ সূত্রের কথা উপস্থাপন করেছেন।

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- মানবসভ্যতা বিকাশে মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চার সাফল্যের কথা বর্ণনা করতে পারবেন।
- মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিচিত্র রূপ ও তার মৃত্যুঞ্জয়ী সত্তার পরিচয় প্রদান করতে পারবেন।
- পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য মানুষের অন্তহীন সাধনার কথা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
বিবর্তন বুদ্ধি – যার বুদ্ধি ক্রমে ক্রমে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পূর্নতার দিকে অগ্রসর হয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। **বিদ্যুৎ মোহন** – যা বিদ্যুৎকেও মোহিত করে, অতিশয় রূপবান। **বজ্রমুষ্টিধর** – বজ্রকে যে মুঠোর মধ্যে ধরে রাখে। **নীহারিকা** – আকাশে দৃষ্ট বহু দূরের নক্ষত্র সমষ্টি। **উদ্দীপ্ত** – যা জ্বলে উঠেছে। **তেজস** – দীপ্তিমান, উজ্জ্বল।	**৭** প্রবীণ সমাজ পদে, প্রৌঢ় আমি জুড়ি দুই কর, নমি, হে বিবর্ত বুদ্ধি! বিদ্যুৎ-মোহন, বজ্র মুষ্টিধর! চরণে ঝটিকাগতি–ছুটিছ উধাও দলি নীহারিকা। উদ্দীপ্ত তেজসনেত্র-হেরিছ নির্ভয়ে সপ্তসূর্য শিখা। গ্রহে গ্রহে আবর্তন–গভীর নিনাদ শুনিছ শ্রবণে?

সলাঙ্গুল দেহ – লেজসহ দেহ। সলেজ অবয়ব।

সার্থক কাম – যার আকাঙ্ক্ষা সার্থক হয়েছে, যার কামনা ফলপ্রসূ হয়েছে।

দেবতালাঞ্ছন – দেবতার রূপকেও যা হার মানায়, দেবতাকে লাঞ্ছিত করে এমন কোনো অপূর্ব সুন্দর।

কালের পৃষ্ঠায় – সময়ের বুকে।

দর্শনে – দর্শনশাস্ত্রে।

নমি – নমস্কার করি।

বিশ্বগ ভাব – বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত ভাবনা।

আজন্ম – জন্ম থেকে, শুরু থেকে।

হেলিছ-দুলিছ ... সীমা-কূল – মানুষের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও কর্মপ্রয়াস সমুদ্রের তরঙ্গমালার মতো দুর্বার হয়ে উঠেছে।

মহামার – প্রবল হৈ-চৈ, গণ্ডগোল, হুলস্থূল।

নিস্তার – মুক্তি বা পরিত্রাণ।

দোলে মহাকাল-কোলে অণু পরমাণু
বুঝিছ স্পর্শনে?

৮

নমি, হে সার্থক কাম! স্বরূপ তোমার
নিত্য অভিনব!
মরদেহে নহ মর, অমর অধিক
স্থৈর্য ধৈর্য তব?
লয়ে সলাঙ্গুল দেহ, স্থূলবুদ্ধি তুমি
জন্মিলে জগতে!
শুষিলে সাগর শেষে, রসাইলে মরু
উড়ালে পর্বতে!
গড়িলে আপন মূর্তি–দেবতালাঞ্ছন
কালের পৃষ্ঠায়!
গড়িছ ভাঙ্গিছ তর্কে, দর্শনে বিজ্ঞানে
আপন স্রষ্টায়।

৯

নমি, হে বিশ্বগ ভাব! আজন্ম চঞ্চল,
বিচিত্র, বিপুল!
হেলিছ-দুলিছ সদা, পড়িছ আছাড়ি;
ভাঙ্গি সীমা-কূল!
কীঘর্ষণ– কি বর্ষণ, লম্ফন-গর্জন,
দ্বন্দ্ব মহামার!
কে ডুবিল–কে উঠিল, নাহি দয়ামায়া,
নাহিক নিস্তার!
নাহি তৃপ্তি, নাহি শ্রান্তি, নাহি ভ্রান্তি ভয়!
কোথায়-কোথায়!
চিরদিন এক লক্ষ্য–জীবন বিকাশ
পরিপূর্ণ তায়!

ভাবসংক্ষেপ

কবি বিবর্তনশীল মানব-প্রজ্ঞার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে নানা অভিযান চালিয়ে মানুষ বিপুল জ্ঞান অর্জন করেছে। মহাকালের আহ্বানে দিয়েছে সাড়া। মানুষের এ অভিযানের সাফল্য কবিকে বিস্মিত ও কৌতূহলী করেছে, করেছে অভিভূত।

উদ্যমী মানুষের প্রতি কবি গভীর শ্রদ্ধা ও অভিবাদন জ্ঞাপন করেছেন। মানুষ মরণশীল হয়েও বিপুল কর্ম ও সাফল্যের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে তার অমরত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। কালের পৃষ্ঠায় মানুষ প্রতিষ্ঠা করেছে তার অক্ষয়-অমর কীর্তি। মানুষ তার আপন বুদ্ধিবলে সাগর সেঁচে সমুদ্রের তলদেশ থেকে সম্পদ আহরণ করেছে, মরুভূমিকে পরিণত করেছে

মরূদ্যানে, পর্বতের শীর্ষদেশে উড়িয়ে দিয়েছে মানবের বিজয়-পতকা। মানুষ তর্ক-দর্শন-বিজ্ঞান বিকশিত করেছে এবং আপন স্রষ্টাকে কখনও গড়েছে কখনও ভেঙেছে।

মানুষের অগ্রযাত্রার মূল লক্ষ্য পরিপূর্ণতা অর্জন। অগ্রযাত্রার পথ পাড়ি দিতে গিয়ে মানুষ সীমাহীন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে মরণ সংগ্রাম চালিয়েছে এবং বার বার নানা ভ্রান্তির গোলক ধাঁধায় হোঁচট খেয়েছে। কিন্তু মানুষের অনুসন্ধিৎসা কখনো আটকা পড়েনি এবং চলার গতিও কখনও থেমে যায়নি। জীবনে পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য মানুষের এ অগ্রযাত্রার কোনো বিরাম নেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. প্রবীণ সমাজপদে কবি কেন প্রণাম নিবেদন করেছেন?
২. 'মর দেহে নহ মর' এবং 'লয়ে সলাঙ্গুল দেহ' কথা-দুটির অর্থ কী?
৩. 'গড়িছ আপন মূর্তি – দেবতালাঞ্ছন কালের পৃষ্ঠায়! – চরণদ্বয় দ্বারা কবি কী বুঝাতে চেয়েছেন?
৪. মানুষ কিভাবে তার অগ্রযাত্রার পথে ধাবিত হয়েছে?
৫. কবির মতে, মানুসের অগ্রযাত্রার মূল লক্ষ্য কী?

উত্তর

প্রশ্ন : প্রবীণ সমাজপদে কবি কেন প্রণাম নিবেদন করেছেন?

উত্তর : কবি বিবর্তনশীল মানবসমাজের প্রতি প্রণাম নিবেদন করেছেন। গতির আবেগে যাবতীয় প্রতিকূলতাকে তুচ্ছ করে মানুষ। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে অভিযান চালিয়ে মানুষ নির্ভয়ে আকাশ-অভিযানে অগ্রসর হয়েছে, মহাকালের আহ্বানে দিয়েছে সাড়া। মানুষের এ অন্তহীন অভিযানের সাফল্য কবিকে বিস্মিত ও কৌতূহলী করেছে, করেছে অভিভূত। মানুষের এ বিপুল কর্মকাণ্ডের জন্যই তিনি প্রবীণ সমাজপদে তাঁর প্রণাম নিবেদন করেছেন।

প্রশ্ন : 'মর দেহে নহ মর' এবং ''লয়ে সলাঙ্গুল দেহ' কথাদ্বয়ের অর্থ কী?

উত্তর : জাগতিক নিয়ম অনুসারে পৃথিবীর সকল প্রাণীর মতো মানুষও মরণশীল। মানুষ মরণশীল হলেও, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দেহের মতো, তার কীর্তি বিলীন হয়ে যায় না। কেননা, মানুষ মরণশীল মানুষের অমরত্বের প্রতিই আলোকপাত করেছেন। একথা ঐতিহাসিক সত্য যে, বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষ আজকের এ দৈহিক-অবয়ব লাভ করেছে। এককালের লেজওয়ালা বানর থেকেই ক্রমবির্তনের প্রক্রিয়ায় মানুষের জন্ম। ক্রমবিবর্তনের এক বিশেষ পর্যায়ে মানুষের দেহ থেকে লেজ খসে পড়েছে। তারপর নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষ বর্তমান কালের অবয়ব লাভ করেছে। 'লঢে সলাঙ্গুল দেহ' চরণাংশের মাধ্যমে কবি এ-কথাই বলতে চেয়েছেন।

প্রশ্ন : কবির মতে মানুষের অগ্রযাত্রার মূল লক্ষ্য কী?

উত্তর : কবির মতে, আবির্ভাবের পর থেকে নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে মানুষ অগ্রসর হয়েছে সামনের দিকে। মানুষের এ অগ্রযাত্রার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে পরিপূর্ণতা অর্জন। অগ্রযাত্রার পথ পাড়ি দিতে গিয়ে মানুষ সীমাহীন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে মরণ সংগ্রাম চালিয়েছে এবং বার বার নানা ভ্রান্তির গোলক-ধাঁধায় হোঁচট খেয়েছে। কিন্তু মানুষের অনুসন্ধিৎসা কখনো আটকা পড়েনি এবং চলার গতিও কখনও থেমে যায়নি। জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য মানুষের এ অগ্রযাত্রার কোনো বিরাম নেই।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. প্রবীণ সমাজ পদে, আজি প্রৌঢ় আমি
জুড়ি দুই কর,
নমি হে বিবর্ত বুদ্ধি! বিদ্যুৎ-মোহন,
বজ্র মুষ্টিধর!

২. নমি, হে সার্থক কাম! স্বরূপ তোমার
নিত্য অভিনব!
মর দেহে নহ মর, অমর অধিক
স্থৈর্য ধৈর্য তব?

৩. গড়িছ ভাঙ্গিছ তর্কে, দর্শনে বিজ্ঞানে
আপন স্রষ্টায়।

৪. নমি, হে বিশ্বগ ভাব! আজন্ম চঞ্চল,
বিচিত্র, বিপুল!
হেলিছ-দুলিছ সদা, পড়িছ আছাড়ি
ভাঙ্গি সীমা কূল!

৫. নাহি তৃপ্তি, নাহি শ্রান্তি, নাহি ভ্রান্তি ভয়
কোথায়-কোথায়!
চিরদিন এক লক্ষ্য – জীবন বিকাশ
পরিপূর্ণ তায়!

উত্তর :

১। **প্রবীণ সমাজ পদে, আজি প্রৌঢ় আমি**
জুড়ি দুই কর,
নমি হে বিবর্ত বুদ্ধি! বিদ্যুৎ-মোহন,
বজ্র মুষ্টিধর!

আলোচ্য অংশটুকু অক্ষয়কুমার বড়াল-বিরচিত 'মানব-বন্দনা' শীর্ষক কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে কবি তার পূর্বসূরী মানব প্রজন্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

বিবর্তনের নানা পথ পরিক্রমা শেষে মানুষ আজ এ অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। কবি এ বির্তনশীল মানবপ্রজ্ঞার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। মানুষ বিদ্যুৎ আবিষ্কার করেছে, গতির আবেগে যাবতীয় প্রতিকূলতাকে তুচ্ছ করে মহাশূন্যে অভিযান পরিচালনা করেছে। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে নানা অভিযান চালিয়ে মানুষ বিপুল জ্ঞান অর্জন করেছে। মানুষ নির্ভয়ে আকাশ অভিযানে অগ্রসর হয়েছে, মহাকালের আহ্বানে দিয়েছে সাড়া। মানুষের এ অন্তহীন অভিযানের সাফল্য কবিকে বিস্মিত ও কৌতূহলী করেছে, করেছে অভিভূত। মানুষের এ বিপুল কর্মকান্ডের জন্যই তিনি প্রবীণ সমাজপদে তাঁর প্রণাম নিবেদন করেছেন।

২। **নমি, হে সার্থক কাম! স্বরূপ তোমার**
নিত্য অভিনব!
মর দেহে নহ মর, অমর অধিক
স্থৈর্য ধৈর্য তব?

আলোচ্য অংশটুকু কবি অক্ষয়কার বড়াল রচিত 'মানব-বন্দনা' শীর্ষক কবিতা থেকে গৃহীত হয়েছে। কবি এখানে মরণশীল মানুষের কীর্তিময় অমরত্বের কথা ব্যক্ত করেছেন।

জগতের শাশ্বত নিয়ম অনুসারে পৃথিবীর সকল প্রাণীর মতো মানুষও মরণশীল। মানুষ মরণশীল হলেও, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মতো তার কীর্তি বিলীন হয়ে যায় না। কেননা, মানুষ মরণশীল হলেও মানুষের আত্মঅমর এবং তার সৃষ্টিসম্ভার অক্ষয় ও অবিনশ্বর। আলোচ্য অংশে কবি মরণশীল মানুষের এ কীর্তিময় অমরত্বের কথাই প্রকাশ করেছেন। এ-কথা ঐতিহাসিক সত্য যে, বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষ আজকের এ দৈহিক অবয়ব লাভ করেছে। কবি তাই বিবর্তন চঞ্চল এবং কীর্তিময় এ মানব প্রজাতির প্রতি তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা ও অভিবাদন জ্ঞাপন করেছেন।

৫। **নাহি তৃপ্তি, নাহি শ্রান্তি, নাহি ভ্রান্তি ভয়!**
কোথায়-কোথায়!
চিরদিন এক লক্ষ্য - জীবন বিকাশ
পরিপূর্ণ তায়!

আলোচ্য অংশটুকু কবি অক্ষয়কুমার বড়াল বিরচিত 'মানব-বন্দনা' শীর্ষক কবিতা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এ অংশে মানুষের অগ্রযাত্রার পরম লক্ষ্য সম্পর্কে কবির ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে।

আবির্ভাবের পর থেকে নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে মানুষ অগ্রসর হয়েছে সামনের দিকে। মানুষের এ অগ্রযাত্রার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে মানুষ সীমাহীন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে মরণ সংগ্রাম চালিয়েছে এবং বার বার নানা ভ্রান্তির গোলক-ধাঁধায় হোঁচট খেয়েছে। কিন্তু মানুষের অনুসন্ধিৎসা কখনো আটকা পড়েনি এবং চলার গতিও কখনও থেমে যায়নি। জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য মানুষের এ অগ্রযাত্রার কোনো বিরাম নেই। আলোচ্য অংশে মানুষের এ পরিপূর্ণ বিকাশের লক্ষ্যের কথাই কবি বলতে চেয়েছেন।

পাঠ ৪

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- মানুষের একক ও ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের ফলে সভ্যতা কিভাবে গড়ে উঠেছে, তার পরিচয় দিতে পারবেন।
- মানুষকে কবি কেন বন্দনা করেছেন, তা লিপিবদ্ধ করতে পারবেন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
নরদেব – নরদেবতা, মানুষরূপী দেবতা। **শষ্পভূমি** – সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠ বা প্রান্তর। **সুবর্ণ কলস** – সোনার কলসি। কিরণে রশ্মিতে, আলোতে।	**১০** নমি তোমা নরদেব! গর্বে গৌরবে দাঁড়িয়েছ তুমি! সর্বাঙ্গে প্রভাতরশ্মি, শিরে চূর্ণ মেঘ, পদে শুষ্পভূমি। পশ্চাতে মন্দির-শ্রেণী, সুর্বণ, কলস,

নবীন উদগীথ – নতুন মন্ত্র।
পবনে – বাতাসে।
সনে – সঙ্গে।
ক্রমব্যতিক্রম – ক্রম-বিবর্তন।
উদয়-বিলয় – আবির্ভাব ও বিনাশ।
দ্বিজ – ব্রাহ্মণ।
চণ্ডাল – চাঁড়াল, নীচু জাত।
আদ্বিজ চণ্ডাল – ব্রাহ্মণ থেকে চণ্ডাল পর্যন্ত।
তক্ষক – ছুতোর অর্থে ব্যবহৃত।
অদ্রিতলে – পর্বতের নীচে।
বরেণ্য – বরণীয়।
শরণ্য – রক্ষাকারী।

ঝলসে কিরণে;
কলকণ্ঠ-সমুত্থিত নবীন উদ্‌গীথ
গগনে পবনে।
হৃদয়-স্পন্দন সনে ঘুরিছে জগৎ
চলিছে সময়;
ভ্রুভঙ্গে—ফিরিছ সঙ্গে—ক্রমব্যতিক্রম
উদয়-বিলয়।

১১

নমি আমি প্রতিজনে, আদ্বিজ চণ্ডাল,
প্রভু, ক্রীতদাস!
সিন্ধুমূলে জলবিন্দু, বিশ্বমূলে অণু;
সমগ্রে প্রকাশ!
নমি কৃষি-তন্তুজীবী, স্থপতি, তক্ষক,
কর্ম, চর্মকার!
অদ্রিতলে শিলাখণ্ড—দৃষ্টি অগোচরে,
বহ অদ্রি-ভার!
কত রাজ্য, কত রাজা গড়িছ নীরবে
হে পূজ্য, হে প্রিয়!
একত্বে বরণ্যে তুমি, শরণ্য এককে, –
আত্মা আত্মা।

ভাবসংক্ষেপ

কবি বিপুল গর্ব আর গৌরবের অধিকারী মানুষ দেবতার প্রতি তাঁর অন্তহীন শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিবেদন করেছেন। মানুষের চারদিকেই আজ নানা কীর্তিময় গৌরবগাথার ছড়াছড়ি। বিবর্তনের বিশেষ এক পর্যায়ে মানুষ ধর্মীয় উপাসনালয় তৈরি করেছে। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মানুষ নতুন নতুন কৃৎ-কৌশল আবিষ্কার করেছে এবং এভাবে সে আকাশ ও বাতাসকে জয় করেছে।

জাতি ধর্ম বর্ণ ও গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকল মানুষের মিলিত প্রয়াসে অসহায় আদি মানুষ ক্রমবির্তনের প্রক্রিয়ায় আজ উন্নতির স্বর্ণ শিখরে উপনীত হয়েছে। মানবসমাজের উদ্ভব ও বিবর্তনের ধারায় সকল মানুষেরই রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা – এক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ এবং নিম্নবর্ণের চন্ডালের অবদান সমান গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত। সভ্যতার অগ্রযাত্রায় প্রভু-ভৃত্য, উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র সকল শ্রেণীর মানুষেরই কম-বেশি ভূমিকা রয়েছে। সর্বশ্রেণীর মানুষের সম্মিলিত কর্ম প্রয়াসের ভিত্তিতেই মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশ ও চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। এ কারণেই কবি সকল মানুষের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও প্রণাম নিবেদন করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. মানুষের একক ও ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের ফলে সভ্যতা কিভাবে গড়ে উঠেছে?
২. কবি মানুষকে কেন বন্দনা করেছেন?
৩. আকাশে এবং বাতাসে মানুষ কিভাবে তার জয়বার্তা ঘোষণা করেছে?

৪. আদ্বিজ-চণ্ডাল বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

৫. 'একত্বে বরেণ্য তুমি, শরণ্য এককে' –কথাটির তাৎপর্য কী?

প্রশ্ন : কবি মানুষকে কেন বন্দনা করেছেন?

উত্তর : ধর্ম-বর্ণ ও গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকল মানুষের মিলিত প্রয়াসে অসহায় আদি মানুষ ক্রমবির্তনের প্রক্রিয়ায় আজ উন্নতির স্বর্ণ-শিখরে উপনীত হয়েছে। মানব সমাজের উদ্ভব ও বিবর্তনের ধারায় সকল মানুষেরই রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। এ ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ এবং নিম্নবর্ণের চণ্ডালের অবদান সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যমণ্ডিত। সভ্যতার অগ্রযাত্রায় প্রভু-ভৃত্য, উচ্চনীচ, ধনীদরিদ্র সকল শ্রেণীর মানুষেরই কম-বেশি ভূমিকা রয়েছে। সর্বশ্রেণীর মানুষের সম্মিলিত কর্মপ্রয়াসের ভিত্তিতেই মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশ ও চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। এ কারণেই কবি মানুষকে বন্দনা করেছেন, শ্রদ্ধা জানিয়েছেন মানবের বিরামহীন কর্মপ্রয়াসকে।

প্রশ্ন : আদ্বিজ-চণ্ডাল বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

উত্তর : 'আদ্বিজ-চণ্ডাল' শব্দগুচ্ছ দিয়ে সকল শ্রেণীর মানুষকে বুঝাতে চেয়েছেন। ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে চাঁড়াল, অর্থাৎ অভিজাত অনভিজাত, উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর মানুষকে বোঝাতেই কবি ব্যবহার করেছেন 'আদ্বিজ-চণ্ডাল' শব্দগুলো। মানব সভ্যতা বিকাশে আদিকাল থেকে সকল মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং বিরামহীন পরিশ্রমের ফলে বৈরী প্রকৃতির ওপর মানুষের নিয়ন্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং সভ্যতার উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। সভ্যতা বিকাশে এ সকল শ্রেণীর মানুষকে বোঝাতেই কবি 'আদ্বিজ-চণ্ডাল' শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেছেন।

প্রশ্ন : 'একত্বে বরেণ্য তুমি, শরণ্য, এককে'–কথাটির তাৎপর্য কী?

উত্তর : বিবর্তনের নানা পর্যায় অতিক্রম করে মানুষ সভ্যতার চরম স্তরে উপনীত হয়েছে। জাতি-বর্ণ এবং গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকল মানুষের মিলিত প্রয়াসের ফলেই মানবসভ্যতা আজ উন্নতির শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেছে। সভ্যতার অগ্রযাত্রায় প্রভু-ভৃত্য, উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র সকল শ্রেণীর মানুষেরই কম বেশি ভূমিকা রয়েছে। ক্ষুদ ক্ষুদ্র জলবিন্দুর সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় সুবিশাল সমুদ্র, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনু পরমাণুর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে গোটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড। একইভাবে অগণিত মানুষের সম্মিলিত কর্মপ্রয়াসের ফলেই গড়ে উঠেছে বর্তমানের অতুলনীয় মানবসভ্যতা। এ কারণে কবি সকল মানুষকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন এবং তাদের সঙ্গে উপলব্ধি করেছেন গভীর একাত্মা।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. নমি তোমা নরদেব! কি গর্বে গৌরবে
দাঁড়িয়েছ তুমি!
সর্বাঙ্গে প্রভাতরশ্মি, শিরে চূর্ণ মেঘ,
পদে শুষ্পভূমি।

২. হৃদয় স্পন্দন সনে ঘুরিছে জগৎ
চলিছে সময়;
ভ্রুভঙ্গে– ফিরিছ সঙ্গে–ক্রমব্যতিক্রম
উদয়-বিলয়।

৩. নমি আমি প্রতিজনে, আদ্বিজ চণ্ডাল,
প্রভু, ক্রীতদাস!
সিন্ধুমূলে জলবিন্দু, বিশ্বমূলে অণু;
সমগ্রে প্রকাশ।

৪. একত্বে বরেণ্য তুমি, শরণ্য এককে–
আত্মা আত্মীয়।

উত্তর :

৩। **নমি আমি প্রতিজনে, আদ্বিজ-চণ্ডাল,**
প্রভু, ক্রীতদাস!
সিন্ধুমূলে জলবিন্দু, বিশ্বমূলে অণু;
সমগ্রে প্রকাশ।

আলোচ্য অংশটুকু অক্ষয়কুমার বড়াল– বিরচিত 'মানব-বন্দনা' শীর্ষক কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে। মানবসভ্যতা বিকাশে সকল শ্রেণীর মানুষ কিভাবে ভূমিকা পালন করেছে, সে কথা এখানে ব্যক্ত হয়েছে।

মানবসভ্যতা বিকাশে আদিকাল থেকে সকল মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা আজ উন্নতির স্বর্ণশিখরে উপনীত হয়েছি। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা এবং বিরামহীন পরিশ্রমের ফলে বৈরী প্রকৃতির ওপর মানুষের নিয়ন্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং সভ্যতার উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। সভ্যতার অগ্রযাত্রায় প্রভু-ভৃত্য, উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র সকল শ্রেণীর মানুষেরই কম বেশি ভূমিকা রয়েছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দুর সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় সুবিশাল সমুদ্র, সূক্ষ্ম অণূ-পরমাণুর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। একইভাবে অগণিত মানুষের সম্মিলিত কর্মপ্রয়াসের ফলেই গড়ে উঠেছে বর্তমানের অতুলনীয় মানবসভ্যতা। মানবসভ্যতার স্রষ্টা বলে কবি আদিকাল থেকে এ পর্যন্ত সকল মানুষকে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

৪। *একত্বে বরেণ্য তুমি, শরণ্য এককে, –*
আত্মার আত্মীয়।

আলোচ্য অংশটুকু কবি অক্ষয়কুমার বড়াল-বিরচিত 'মানব-বন্দনা' শীর্ষক কবিতা থেকে উৎকলিত হয়েছে। বর্তমান অংশে কবি মানবসভ্যতা সৃষ্টিকারী সকল মানুষের সঙ্গে গভীর একাত্মা ঘোষণা করেছেন।

মানবসভ্যতা বিকাশে আদিকাল থেকে সকল মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা আজ উন্নতির স্বর্ণশিখরে উপনীত হয়েছি। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা এবং বিরামহীন পরিশ্রমের ফলে বৈরী প্রকৃতির ওপর মানুষের নিয়ন্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং সভ্যতার উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। সভ্যতার অগ্রযাত্রায় প্রভু-ভৃত্য, উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র জলবিন্দুর সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় সুবিশাল সমুদ্র, সূক্ষ্ম অনু পরমাণুর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে গোটা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে। একইভাবে অগণিত মানুষের সম্মিলিত কর্মপ্রয়াসের ফলেই গড়ে উঠেছে বর্তমানের অতুলনীয় মানবসভ্যতা। মানবসভ্যতার স্রষ্টা বলে কবি আদিকাল থেকে এ-পর্যন্ত সকল মানুষকে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। ঐক্যবদ্ধ মানব-শক্তির উৎস হিসেবে কিংবা একক মানুষের কর্মপ্রয়াস হিসেবে কবি পৃথিবীর সকল মানুষের সঙ্গে গভীর একাত্মা ঘোষণা করেছেন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

নিচের রচনামূলক প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য-উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে, সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে সব প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়নি, সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

প্রশ্ন

১. 'মানব-বন্দনা' কবিতার নামকরণের সার্থকতা বিচার করুন।
২. 'মানব-বন্দনা' কবিতায় মানবজাতির ক্রম-বিবর্তনের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তা বর্ণনা করুন।
৩. 'মানব-বন্দনা' কবিতা অবলম্বনে মানব ইতিহাসের শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের বর্ণনা দিন।
৪. কবি কেন মানবকে বন্দনা করেছেন? 'মানববন্দনা' কবিতা অবলম্বনে আলোচনা করুন।
৫. 'মানব-বন্দনা' কবিতার অবলম্বনে মানুষের আদিকাল অবস্থার পরিচয় দিন।

উত্তর

প্রশ্ন : 'মানব-বন্দনা' কবিতার নামকরণের সার্থকতা বিচার করুন।

উত্তর : কবিতার নামকরণের সার্থকতা প্রধানত মূল ভাবের ওপর নির্ভরশীল। ছোটগল্প, উপন্যাস বা নাটকে চরিত্রনাম কিংবা স্থাননামকে কেন্দ্র করে নামকরণ হলেও কবিতার ক্ষেত্রে তা সাধারণত হয় না। কবিতার ক্ষেত্রে প্রধানত মূল ভাব বা অন্তর্নিহিত তাৎপর্যই নামকরণের ক্ষেত্রে প্রধানত মূল ভাব বা অন্তর্নিহিত তাৎপর্যই নামকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্ব পায়। আলোচ্য 'মানব বন্দনা' কবিতার নামকরণের ক্ষেত্রেও কবি অক্ষয়কুমার বড়াল কবিতার মূলভাবকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আলোচ্য কবিতার নাম 'মানববন্দনা' কতটা সার্থক হয়েছে, তা-ই বিবেচ্য বিষয়।

সৃষ্টির আদি-লগ্নে মানুষ ছিল নিঃসঙ্গ ও অসহায়। সাহায্যের জন্য মানুষ করুণ কান্নায় আকাশ-বাতাস মুখরিত করলেও, সেদিন তাদের সাহায্যের জন্য দেবতা বা অলৌকিক কোনো শক্তি এগিয়ে আসেননি। নিরুপায় মানুষ বাঁচার প্রত্যাশায় সেদিন তার স্বজাতিকেই আহ্বান করেছে। হিংস্র জীব-জন্তু, ভয়ঙ্কর পাখি এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে মানুষই সেদিন মানুষকে রক্ষা করেছে। তারা একে অন্যকে সাহায্য করেছে, শোকে যুগিয়েছে সান্ত্বনা, সরবরাহ করেছে আরাম আয়েশের উপকরণ। এভাবেই প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে মানুষ ভবিষ্যত উন্নতির পথে পা বাড়িয়েছে।

সভ্যতার শৈশবকালে মানুষ সঙ্ঘবদ্ধভাবে শিকার করতে শিখেছে। তীর ধনুকের ব্যবহার, নৌকা চালনা, চামড়ার পোশাক পরিধান এবং আগুনের ব্যবহার শিখে মানুষ ক্রমেই সভ্যতার শীর্ষচূড়ায় যাত্রা করেছে। এরপর তারা কৃষিকাজ করেছে। ফলে তাদের জীবনের সূচিত হয়েছে ব্যাপক পরিবর্তন। এরপর মানুষ নগর ও প্রাসাদ নির্মাণ করেছে, জল-স্থল অন্তরীক্ষে ঘোষণা করেছে মানবের বিজয় বার্তা। প্রকৃতি ও পঞ্চভূতকে নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের সভ্যতা ক্রমেই উন্নতির পথে ধাবিত হয়েছে।

কবি বিবর্তনশীল মানব প্রজ্ঞার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে নানা অভিযান চালিয়ে মানুষ বিপুল জ্ঞান অর্জন করেছে। মানুষের এই অন্তহীন অভিযানের সাফল্য কবিকে বিস্মিত ও কৌতূহলী করেছে।

অভিযানপ্রিয় উদ্যমী মানুষের প্রতি কবি গভীর শ্রদ্ধা ও অভিবাদন জ্ঞাপন করেছেন। মানুষ মরণশীল হয়েও বিপুল কর্ম ও সাফল্যের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে তার অমরত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। কালের পৃষ্ঠায় মানুষ প্রতিষ্ঠা করেছে তার অক্ষয় অমর কীর্তি। কবির মতে, মানুষের এ অগ্রযাত্রার মুল লক্ষ্যই হচ্ছে পরিপূর্ণতা অর্জন।

কবি বিপুল গর্ব আর গৌরবের অধিকারী মানুষ দেবতার প্রতি তাঁর অন্তহীন শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিবেদন করেছেন। মানুষের চারদিকেই আজ নানা কীর্তিময় গৌরবগাথার ছড়াছড়ি। জাতি ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকল মানুষের মিলিত প্রয়াসে অসহায় আদি মানুষ ক্রম বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় আজ উন্নতির স্বর্ণ শিখরে উপনীত হয়েছে। মানব সমাজের উদ্ভব ও বিবর্তনের ধারায় সকল মানুষেরই রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা – এ ক্ষেত্রে উচ্চ-বর্ণের ব্রাহ্মণ এবং নিম্নবর্ণের চণ্ডালের অবদান সমান গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত। সভ্যতার অগ্রযাত্রায় প্রভু-ভৃত্য, উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র সকল শ্রেণীর মানুষেরই কম বেশি ভূমিকা রয়েছে। সর্বশ্রেণীর মানুষের সম্মিলিত কর্ম-প্রয়াসের ভিত্তিতেই মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। এ-কারণেই কবি সকল মানুষের প্রতি তার শ্রদ্ধা ও প্রণাম নিবেদন করেছেন।

অতএব, দেখা যাচ্ছে, 'মানব-বন্দনা' কবিতায় কবি মানবসভ্যতা বিকাশের ক্রমিক স্তরসমূহ উল্লেখ করে সভ্যতা বিকাশে মানুষের সম্মিলিত প্রয়াসের কথা বলেছেন এবং সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিবেদন করেছেন। এদিক থেকে আলোচ্য কবিতার নাম 'মানব-বন্দনা' খুবই যুক্তিযুক্ত ও সার্থক হয়েছে।

প্রশ্ন : 'মানব-বন্দনা' কবিতায় মানবজাতির ক্রমবিবর্তনের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তা বর্ণনা করুন।

উত্তর : অক্ষয়কুমার বড়ালের 'মানব-বন্দনা' কবিতায় মানবজাতির ক্রমবিবর্তনের চিত্র চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। কবি বৈজ্ঞানিকের মতই মানব সভ্যতা বিকাশের ক্রমিক পরিচয় উপস্থাপন করেছেন। আমরা নীচে অক্ষয়কুমার বড়ালের অনুসরণে মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের চিত্র উপস্থাপন করছি।

সৃষ্টির প্রথম লগ্নে মানুষ ছিল ভয়াবহভাবে নিঃসঙ্গ ও অসহায়। হিংস্র পশু পাখি এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে বাঁচার জন্য মানুষ সেদিন কাতর আর্তনাদ করেছে। কিন্তু মানুষকে সাহায্যের জন্য সেদিন স্বর্গের দেবতা বা অলৌকিক কোন শক্তি এগিয়ে আসেনি। মানুষই মানুষকে সাহায্য করেছে এবং নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে।

সৃষ্টির ঊষাকালে বৃক্ষলতা এবং জঙ্গলাকীর্ণ পৃথিবী ছিল মানুষের বসবাসের সম্পর্ণ অনুপযুক্ত। জলে-স্থলে-আকাশে সর্বত্রই ছিল মানুষের জন্য ভয়ঙ্কর সব বিপদের হাতছানি। কিন্তু মানুষ নিজেদের প্রচেষ্টায় সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি দিয়ে এসব

প্রতিকূলতা অতিক্রম করেছে, এবং বৈরী প্রকৃতির ওপর নিজেদের নিয়ন্ণ প্রতিষ্ঠা করেছে। কারো সাহায্য নয়, নিজেদের কর্মপ্রয়াস এবং আপন বুদ্ধি দিয়েই মানুষ এভাবে সামনের দিকে অগ্রসর হয়েছে।

জলাশয় ও কর্দমাক্ত পৃথিবীতে মানুষ নিত্য-নতুন সভ্যতা নির্মাণ করেছে। সভ্যতার এ বিকাশ যাত্রাকে কবি তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন। এ স্তর তিনটি হলো- মানবসভ্যতার শৈশবকাল, মানব-সভ্যতার কৈশোরকাল এবং মানবসভ্যতার যৌবনকাল। সভ্যতার শৈশবকালে মানুষ ছিল গুহাবাসী, শিকারই ছিল তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এ-পর্বেই মানুষ ক্রমে আগুনের ব্যবহার শিখে নেয়। আগে যেখানে পশু-পাখির কাঁচা মাংস খেত মানুষ, এখন তা আগুনে পুড়িয়ে খাওয়ার কথা শিখলো তারা। এ-সময়েই মানুষ বড় বড় গাছ, পাথর ইত্যাদি পূজো দিতে আরম্ভ করে। সভ্যতার শৈশব লগ্নেই মানুষ ঋতুভেদ প্রথা শিখে নেয় এবং চন্দ্র-সূর্যের বন্দনা করতে আরম্ভ করে।

মানবসভ্যতার কৈশোর কালে মানুষ ক্রমশ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ওঠে। ক্রমে তারা সমাজ ও সংসারজীবন গড়ে তোলে। সমাজবদ্ধ মানুষ আস্তে আস্তে সামাজিক নিয়ম-কানুন প্রতিষ্ঠা করে। সভ্যতার কৈশোর লগ্নেই মানুষ কৃষিকাজ আয়ত্ত করে। কবির ভাষায়-

'কৈশোরে কাহার সনে মৃত্তিকা কর্ষণে
হইনু বাহির?
মধ্যাহ্নে কে দিল পাত্রে শালি অন্ন ঢালি'
দধি-দুগ্ধ-ক্ষীর?'

শৈশব পর্বে মানুষ গৃহনির্মাণ করতে শিখলো। এ-সময় থেকেই মানুষ লজ্জা নিবারণের জন্য গাছের বাকল এবং পশুর চামড়া ব্যবহার করতে আরম্ভ করে।

সভ্যতার যৌবন-লগ্নে মানুষ খুব দ্রুত উন্নতি লাভ করতে থাকে। এ সময়ই মানুষ প্রথম বারের মতো নগর প্রতিষ্ঠা করে। রাস্তা-ঘাট, সাঁকো, দুর্গ, পরিখা ইত্যাদি নির্মাণের মাধ্যমে মানুষ ক্রমেই উন্নতির শীর্ষদেশে উঠতে থাকে। তীর ধনুকের পরিবর্তে মানুষ উন্নতমানের শিকারের উপকরণ তৈরী করলো। যৌবন-পর্বে মানুষের এ উন্নতির কথা কবির ভাষায়-

'যৌবনে সাহায্য কার নগর পত্তন,
প্রাসাদ নির্মাণ?
কার ঋক সাম যজুঃ চরক সুশ্রুত,
সংহিতা পুরাণ।'

অর্থাৎ মানবসভ্যতার যৌবন-লগ্নে বস্তুগত উন্নতির পাশাপাশি মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধিগতও নানা পরিবর্তন সাধিত হয়। এ-পর্বেই মানুষ বিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন ও শিল্পচর্চায় ব্রতী হয় এবং জলে-স্থলে আকাশে নানা অভিযান পরিচালনা করে। সভ্যতার যৌবন পর্যায়েই মানুষ প্রকৃতির ওপর তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করে। সময় যতই অগ্রসর হয়েছে, মানুষের চিন্তা, চেতনাও হয়েছে তত বেশি সূক্ষ্ম ও বিজ্ঞানবুদ্ধি হয়েছে প্রখর। নিত্য-নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মাধ্যমে মানবসভ্যতা অতি দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে।

মানুষ নিজের প্রচেষ্টায় ক্রমে সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছে। সভ্যতার আদি, শৈশব, কৈশোর এবং যৌবন স্তর পেরিয়ে মানুষ এখন উন্নতির স্বর্ণশিখরে পৌঁছবার চেষ্টা করছে। সকল শ্রেণীর মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মানবসমাজ ক্রমবিবর্তনের ধাপসমূহ অতিক্রম করে কীভাবে বর্তমান অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে, তা-ই আলোচ্য কবিতার মৌল বিষয়।

প্রশ্ন : কবি মানবকে বন্দনা করেছেন কেন?

উত্তর : অক্ষয়কুমার বড়ালের 'মানব-বন্দনা' কবিতায় কবি মানব সমাজের প্রতি তাঁর অন্তহীন শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিবেদন করেছেন। সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই মানুষ ছিল ভয়াবহভাবে নিঃসঙ্গ ও অসহায়। হিংস্র জীবজন্তু এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে বাঁচার জন্য মানুষ সেদিন কাতর আর্তনাদ করেছে। কিন্তু মানুষকে সাহায্যের জন্য সেদিন দেবতা বা অলৌকিক কোনো শক্তি এগিয়ে আসেন নি। প্রকৃতির নির্মমতার শিকার অসহায় মানুষ সেদিন মানুষের কাছেই সাহায্য কামনা করেছে। মানুষ মানুষকে সাহায্য করে প্রাথমিক অস্তিত্ব রক্ষা করেছে। অতঃপর কালক্রমে মানুষ

গড়ে তুলেছে আজকের এ সমৃদ্ধ সভ্যতা। মানুষের এ অন্তহীন কর্মপ্রয়াসকেই কবি গভীরভাবে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, প্রণাম জানিয়েছেন সম্মিলিত মানবসমাজের প্রতি।

সৃষ্টির ঊষাকালে বৃক্ষলতা এবং জঙ্গলাকীর্ণ পৃথিবী ছিল মানুষের বসবাসের সম্পর্ণ অনুপযুক্ত। জলে-স্থলে আকাশে সর্বত্রই ছিল মানুষের জন্য ভয়ঙ্কর সব বিপদের হাতছানি। কিন্তু মানুষ নিজেদের প্রচেষ্টায় সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি দিয়ে এসব প্রতিকূলতা অতিক্রম করেছে, এবং বৈরী প্রকৃতির ওপর নিজেদের নিয়ন্ণ প্রতিষ্ঠা করেছে। কারো সাহায্য নয়, নিজেদের কর্মপ্রয়াস এবং আপন বুদ্ধি-বলেই মানুষ এভাবেই সামনের দিকে অগ্রসর হয়েছে।

প্রাথমিক অস্তিত্ব সুনিশ্চিত করে কালক্রমে মানুষ সভ্যতা বিকাশের পথে দুর্জয় অভিযানে ব্রতী হয়েছে। গুহাবাসী মানুষ ক্ষুধার অন্ন যোগাতে শিকার পদ্ধতি শিখে নেয়, শিখে নেয় আগুনের ব্যবহার। আগুন আবিষ্কার ও তার ব্যবহার মানুষকে সভ্যতার দিকে অনেক দূর এগিয়ে দিল। আগে যেখানে পশু-পাখির কাঁচা মাংস খেত মানুষ, এখন তারা তা আগুনে খাওয়ার কৌশল রপ্ত করলো, আগুনের সাহায্যে অনেক সূক্ষ্ম ও ধারাল অস্ত্র তৈরি করলো। ক্রমে মানুষ কৃষিকাজ শিখে নিল, শিখে নিল নৌকাচালনা, গাছের বাকল এবং পশুচর্ম পরিধান পদ্ধতি। এক সময় মানুষ পরিবারজীবন গড়ে তুললো, গড়ে তুললো সংসার জীবন।

মানুষ তার জাগতিক প্রয়োজনে প্রবর্তন করলো সামাজিক নিয়ম কানুন ও বিধি-বিধান। ক্রমে মানুষ নানাবিধ সামাজিক এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করা শুরু করল। মানুষের ভবঘুরে জীবনযাত্রার অবসান হলো। জ্ঞান-বিজ্ঞানে মানুষের সভ্যতা অনেক দূর অগ্রসর হলো। এ-সময়ই মানুষ প্রতিষ্ঠা করলো নগর। নগর প্রতিষ্ঠা মানব সভ্যতা বিকাশে পালন করে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা। রাস্তা-ঘাট, সাঁকো-পরিখা, বাজার-গঞ্জ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ক্রমেই মানব সভ্যতা উন্নতির শীর্ষদেশে উপনীত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন-

‘যৌবনে সাহায্য কার নগর পত্তন,
প্রাসাদ নির্মাণ?
কার ঋক সাম যজুঃ চরক সুশ্রুত
সংহিতা পুরাণ।
কে গঠিল দুর্গ, সেতু, পরিখা প্রণালী
পথ, ঘাট, মাঠ?
কে আজ পৃথিবীরাজ- জলে স্থলে ব্যোমে
কার রাজ্য পাট?’

অর্থাৎ মানব সভ্যতার পরম বিকাশলগ্নে বস্তুগত উন্নতির পাশাপাশি মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধিগত নানা পরিবর্তন সাধিত হয়। এ-সময়ই পঞ্চভূত ও প্রকৃতিকে জয় করে মানুষ ক্রমেই নতুন-নতুন সভ্যতা গড়ে তোলে। মানুষের এ বিপুল কর্মপ্রয়াস ও অসাধারণ কর্মকাণ্ডকে কবি বিমুগ্ধ ও অভিভূত চিত্তে লক্ষ করেছেন।

মানুবসভ্যতার এ বিপুল উন্নতি কারো একক সাধনায় বা একক প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠেনি। ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকল মানুষের মিলিত সাধনায় গড়ে উঠেছে আজকের এ বিপুল সভ্যতা। মানবসভ্যতার ভিত গড়ে তুলতে সকল শ্রেণীর মানুষেরই রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। তাই কবি ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, নারী-পুরুষ, ব্রাহ্মণ চন্ডাল সকল শ্রেণীর মানুষের প্রতিই তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

সৃষ্টির আদি-লগ্ন থেকে বর্তমান পর্যন্ত মানবসভ্যতা বিকাশে মানুষের এ বিস্ময়কর কর্মকাণ্ড দেখে কবি বিমুগ্ধ ও অভিভূত। তাই সকল মানুষের প্রতি তিনি তাঁর হৃদয়ের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

ভাষা-বিষয়ক প্রশ্ন

	পঠিত রচনাটির কিছু ভাষা-বিষয়ক প্রশ্ন দেয়া হয়েছে। এগুলোর সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে- সেগুলো ভালভাবে পড়ুন। যেগুলো দেয়া হয়নি- সেগুলো নিজে নিজে করুন।

১. নীচের কবিতাংশ-দুটি গদ্যভাষায় রূপান্তর করুন।

ক) সেই ক্ষুব্ধ অন্ধকারে, মরুত, গর্জনে,
কার অন্বেষণ?
সে নহে বন্দনা-গীত, ভয়ার্ত-ক্ষুধার্ত
খুঁজিছে স্বজন!

খ) নমি আমি প্রতিজনে, আদ্বিজ চন্ডাল,
প্রভু, ক্রীতদাস!
সিন্ধুমূলে জলবিন্দু, বিশ্বমূলে অণু;
সমগ্রে প্রকাশ!

২. নীচের শব্দগুলোর পাঁচটি করে সমার্থ শব্দ লিখুন-
ধরিত্রী, সর্প, পুষ্প, সাগর, বহিত্র

৩. নীচের তৎসম শব্দগুলোর তদ্ভব রূপ লিখুন-
সম্মুখ, লাঙ্গুল, অবসন্ন, কাষ্ঠ, চণ্ডাল।

উত্তর :

প্রশ্ন : নীচের শব্দগুলোর পাঁচটি করে সমার্থ শব্দ লিখুন-

ধরিত্রী – পৃথিবী, বিশ্ব, বসুমতী, ভুবন, নিখিল।
সর্প – সাপ, অহি, ভুজঙ্গ, ফণী, নাগ।
সাগর – সমুদ্র, দরিয়া, অর্ণব, জলধি, রত্নাকর।
পুষ্প– ফুল, প্রসূন, কুসুম, মঞ্জরি, সুমন।
বহিত্র – নৌকা, তরী, তরণী, কিস্তি, বুহিত।

আরও যা পড়তে পারেন

১. মানবসমাজ বিকাশের ধারা ভালোভাবে বুঝবার জন্যে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'যে গল্পের শেষ নেই' গ্রন্থটি পাঠ করুন।
২. 'নৃতত্ত্ব' বিষয়ক যে কোনো বই।

ওরা কাজ করে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি পরিচিতি

১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭মে (১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ) কলকাতার বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জননী সারদা দেবী, রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন সেকালের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সন্তান রবীন্দ্রনাথ শৈশব থেকেই এক অভিজাত পরিমণ্ডলের মাঝে বড় হয়ে ওঠেন। শৈশব-কৈশোরে বিদ্যালয়ে পড়ালেখার প্রতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তেমন মনোযোগী ছিলেন না। ফলে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বেশি দূর অগ্রসর হয়নি।

ঠাকুরবাড়ির অনুকূল পরিবেশে শৈশবেই রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। ১৮৭৬ সালে, রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন পনের, তখন প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ বনফুল। অতঃপর কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ, শিশুসাহিত্য, ভ্রমণসাহিত্য, রম্যরচনা, সংগীত ইত্যাদি শাখায় রবীন্দ্রনাথ রেখে গেছেন তাঁর অসামান্য শিল্প প্রতিভার স্বাক্ষর।

কেবল সাহিত্যিক হিসেবেই নয়, একজন কর্মযোগী মানুষ হিসেবেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনন্য কীর্তির পরিচয় রেখে গেছেন। তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়।' এ বিদ্যালয়ই পরবর্তীকালে 'বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়'-এ রূপলাভ করে। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'গীতাঞ্জলি' (১৯১১) কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে প্রথম কৃষি ব্যাংক স্থাপন করেন। বাংলাদেশের শিলাইদহ, পতিসর এবং সাজাদপুরে জমিদারী তত্ত্বাবধান সূত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য সময় অতিবাহিত করেন। এ সময় তিনি কৃষি উন্নয়ন কল্পে এবং কৃষকের জন্য বহু কল্যাণকর উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকলেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রখরভাবে রাজনীতি সচেতন মানুষ। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগে ইংরেজ প্রশাসনের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি বর্জন করেন। হিটলার-মুসোলিনীর ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধেও তিনি ছিলেন প্রবলভাবে প্রতিবাদ মুখর।

কেবল সাহিত্যিক হিসেবেই নয়, এজন চিত্রশিল্পী হিসেবেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর নামটিকে উজ্জ্বল করে রেখে গেছেন।

বাংলা কাব্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের অবদান নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য। বস্তুত, বাংলা কবিতাকে তিনিই প্রথম দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রসারিত করেন। কবিতার বিষয়বস্তু ও প্রকাশরীতিতে রবীন্দ্রনাথের নিত্য নতুন পরীক্ষা বাংলা কাব্য সাহিত্যে আধুনিকতা আনয়নে পালন করেছে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা।

১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট (১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২ শ্রাবণ) রবীন্দ্রনাথ পরলোকগমন করেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উল্লেখযোগ্য রচনা

কবিতা : মানসী (১৮৯০), সোনারতরী (১৮৯৩), চিত্রা (১৮৯৬), ক্ষণিকা (১৯০০), গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থ (১৯১১), বলাকা (১৯১৬), পুনশ্চ (১৯৩২), জন্মদিনে (১৯৪১), আরোগ্য (১৯৪১), শেষলেখা (১৯৪১) ইত্যাদি।

উপন্যাস : রাজর্ষি (১৮৮৯), চোখের বালি (১৯০৩), গোরা (১৯১০), চতুরঙ্গ(১৯১৬), ঘরে বাইরে (১৯১৬), যোগাযোগ (১৯২৯), শেষের কবিতা (১৯২৯) ইত্যাদি।

ছোটগল্প : গল্পগুচ্ছ (১ম খণ্ড ১৯২৬, ২য় খণ্ড - ১৯২৬, ৩য় খণ্ড ১৯২৭), সে (১৯৩৭), তিন সঙ্গী (১৯৪১), গল্পসল্প (১৯৪১)।

ইউনিটের উদ্দেশ্য

১. কবির ইতিহাস চেতনা ও দার্শনিক বোধ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
২. শ্রমজীবী মানুষ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আস্থা ও বিশ্বাসের কথা ব্যক্ত করতে পারবেন।

ভূমিকা

জীবনের অন্তিম পর্বে রচিত 'আরোগ্য' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থ। 'আরোগ্য'র ১০ সংখ্যক কবিতারই নতুন নামকরণ "ওরা কাজ করে"। 'আরোগ্য' কাব্যগ্রন্থ ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। মৃত্যুর পূর্বে অসুস্থ রবীন্দ্রনাথের সাময়িক আরোগ্য লাভের পর কবিতাগুলি রচিত। চিকিৎসা নিয়ে কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তনের পর কবি গ্রন্থভুক্ত সমস্ত কবিতা মুখে মুখে রচনা করেন।

"ওরা কাজ করে" কবিতায় ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময়ে সাম্রাজ্যলোভী রাজশক্তিসমূহের প্রতিষ্ঠা ও বিলুপ্তির পটভূমিকায় সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের চিরায়ত অস্তিত্বের জয় ঘোষিত হয়েছে। 'আরোগ্য' কাব্যগ্রন্থের রচনাকাল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ের অন্তর্গত। আশৈশব ব্রিটিশ রাজশক্তির শাসন প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তিই ভারতবর্ষকে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণ ঘটিয়েছে এ বিশ্বাস সুদৃঢ় ছিলো রবীন্দ্রনাথের। কিন্তু জীবনের শেষবেলায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির সাম্রাজ্যলোভী শক্তিতে রূপান্তর কবির বিশ্বাসে ফাটল ধরায়। বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে তাঁর চিত্ত। 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ' এ অবিশ্বাসে দীক্ষিত কবির বিশ্বাসের ভিত্তিতে চিড় ধরিয়ে দেয় ব্রিটিশদের প্রতাপ ও লোভী আচরণ। এ অবিক্ষোভই কবিকে টেনে নিয়ে যায় ইতিহাসের জগতে। ইতিহাসের শিক্ষা কবিকে এ বিশ্বাসে উজ্জীবিত করে যে কালস্রোতে সামাজ্যবাদী রাজশক্তির প্রতাপ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিন্তু ঐ রাজশক্তির শোষণে স্বাধীনতাবঞ্চিত সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের জীবনধারা অক্ষুণ্ন থাকে। "ওরা কাজ করে" কবিতায় মানুষের মধ্যকার এ অমিত সম্ভাবনার কথাই রূপায়িত হয়েছে।

"ওরা কাজ করে" কবিতাটি সমিল অক্ষরমাত্রিক বা অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। কবিতাটি প্রধানত ছয় ও আট মাত্রার পর্বে বিন্যস্ত। এতে দশ মাত্রার পর্বও রয়েছে। এ বিন্যাস 'কবিতাটির সংযত গতি ও বিস্ময় মিশ্রিত ভাব ব্যঞ্জিত করতে সহায়তা করেছে'। কবিতাটিতে অলঙ্কারের প্রয়োগ বেশি নেই। তবে তৎসম শব্দ এবং সমাসবদ্ধ পদের প্রাচুর্য কবিতার গাম্ভীর্য প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়েছে। "ওরা" সর্বনাম পদের বহুমাত্রিক প্রয়োগ এ কবিতার একটি বিশিষ্ট দিক।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- ভারতবর্ষে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রাজশক্তির উত্থান পতনের ধারা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ইংরেজ রাজশক্তির আগমন ও পরাক্রমের বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিশাল মহাবিশ্বে প্রবহমান কাল বা সময়ের ভূমিকা সম্পর্কে কবির মনোভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

☞	মূলপাঠটি নীরবে ও সরবে কয়েকবার পড়ুন এবং বুঝবার চেষ্টা করুন। বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ দেয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
অলস – মন্থর, এখানে আসক্তিহীন অর্থে।	অলস সময়-ধারা বেয়ে
সময়ধারা – সময়ের ধারা, সময়স্রোত।	মন চলে শূন্য-পানে চেয়ে।
শূন্যপানে – মহাশূন্যে, আকাশে।	সে মহাশূন্যের পথে ছায়া-আঁকা পড়ে চোখে।
	কত কাল দলে দলে গেছে কত লোকে

ছায়া-আঁকা ছবি – ছায়াজাত ছবি, অন্ধকারে আঁকা ছবি, অস্পষ্ট ছবি।	সুদীর্ঘ অতীতে
জয়োদ্ধত (জয়+উদ্ধত) – বিজয় গর্বে গর্বিত, জয়ের আনন্দে স্পর্ধিত।	জয়োদ্ধত প্রবল গতিতে
সাম্রাজ্যলোভী – পররাজ্যে কর্তৃত্ব বিস্তারে লোভ পোষণকারী।	এসেছে সাম্রাজ্যলোভী পাঠানের দল
পাঠান – (পশ্তু>পখতুন>পটঠোন) **হি.পঠান>বা. পাঠান)** – বর্তমান পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও আফগানিস্তানের মুসলিম গোত্রবিশেষ।	এসেছে মোগল;
মোগল – ভারত ইতিহাসে সম্রাট বাবর ও তাঁর বংশধর।	বিজয়রথের চাকা
শূন্যপথে – মহাশূন্যে, আকাশরূপ পথে।	উড়ায়েছে ধূলিজাল, উড়িয়াছে বিজয়পতাকা।
লৌহবাঁধা – লোহা দ্বারা বাঁধানো, ইস্পাত দৃঢ়।	শূন্যপথে চাই,
অনলনিশ্বাসী রথে – যে রথ আগুনের উত্তাপ ছড়িয়ে চলে।	আজ তার কোনো চিহ্ন নাই।
প্রবল ইংরেজ – সাম্রাজ্যলোভী প্রতাপশালী ইংরাজ জাতি।	নির্মল সে নীলিমায় প্রভাতে ও সন্ধ্যায় রাঙালো
বিকীর্ণ – বিক্ষিপ্ত, ছড়ানো।	যুগে যুগে সূর্যোদয় সূর্যাস্তের আলো।
কাল – সময়, মহাকাল।	আরবার সেই শূন্যতলে
সাম্রাজ্যের দেশ বেড়াজাল – সারা ভারত জুড়ে ব্রিটিশ উপনিবেশের শৃঙ্খল অর্থে প্রযুক্ত।	আসিয়াছে দলে দলে
পণ্যবাহী সেনা – ভাড়া করা সেনা, ব্যবসায় সূত্রে আগত সেনা।	লৌহবাঁধা পথে
জ্যোতিষ্কলোক – নক্ষত্রলোক, নক্ষত্রমণ্ডল, জ্যোতির্মণ্ডল।	অনলনিশ্বাসী রথে
	প্রবল ইংরেজ,
	বিকীর্ণ করেছে তার তেজ।
	জানি তারো পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল,
	কোথায় ভাসায়ে দেবে সাম্রাজ্যের দেশবেড়া জাল;
	জানি তার পণ্যবাহী সেনা
	জ্যোতিষ্ক লোকের পথে রেখামাত্র চিহ্ন রাখিবে না।

ভাবসংক্ষেপ

আকাশ বা মহাশূন্যের দিকে তাকিয়ে আসক্তিহীন সময়স্রোত ধরে কবিমন পরিভ্রমণ করে। মহাশূন্যে অন্ধকারে আঁকা অস্পষ্ট ছবিগুলি চোখে পড়ে তাঁর। যুগে যুগে ঐ সময়স্রোত ধরে বিজয়পর্বে উদ্ধত কত লোক প্রবল গতি বিস্তার করে চলে গেছে। সুদীর্ঘ অতীতের সময়স্রোতে এসেছে পাঠান, বিজয়রথের চাকার ধূলি উড়িয়ে এবং বিজয় পতাকা উত্তোলন করে সদম্ভে এসেছে প্রবল প্রতাপশালী মোগল। কিন্তু মহাশূন্যের সে পথরেখায় আজ আর তাদের কোনো পদচিহ্ন নেই। প্রভাত ও সন্ধ্যায় স্বচ্ছ নীলাকাশ সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের রঙে রঙিন হয়েছে। প্রকৃতির এ বর্ণবৈভব যুগ যুগ ধরে পৃথিবীকে সাজিয়েছে। পুনরায় সেই সময়স্রোত ধরে লোহা বাঁধানো পথে, আগুনের উত্তাপ ছড়ানো রথ চালিয়ে এসেছে সাম্রাজ্যলোভী ইংরেজ। তারা তাদের প্রতাপরশ্মি বিস্তার করেছে সমগ্র দেশে। কবি জানেন বিশাল মহাবিশ্ব বা মহাকালের গর্ভে সময়স্রোত প্রবাহিত হয়ে যাবে। এ অনন্ত সময়স্রোতে সমগ্র দেশকে আবৃত করে ইংরেজ শাসনের যে জাল বিস্তৃত করা হয়েছে তা ভেসে যাবে। কোন রাজশক্তিই জ্যোতির্মণ্ডলে স্থায়ী পদচিহ্ন রেখে যেতে পারেনি, ইংরেজ ও তার অনুগত সেনাদলও নিশ্চিতভাবেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর লিখুন

১. ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজশক্তির উত্থান পতনের পরিচয় দিন।
২. ভারতবর্ষে ইংরাজ আগমনের চিত্র অঙ্কন করুন।
৩. অনলনিশ্বাসী রথে' কথাটির মর্মার্থ কী?
৪. 'সাম্রাজ্যের দেশ-বেড়া জাল' চরণাংশটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নমুনা উত্তর

প্রশ্ন : ভারতবর্ষে ইংরাজ আগমনের চিত্র ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : যুগে যুগে আগত বিভিন্ন রাজশক্তির মতোই মহাকালের সময়স্রোত ধরে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে ইংরেজ। আগুনের উত্তাপ ছড়ানো রথে চড়ে লোহা-বাঁধানো পথে তেজ আর ভীতি ছড়িয়ে ভারতবর্ষে তারা শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে। তাদের প্রতি পদক্ষেপে বিকীর্ণ হয় আগুন ছড়ানো ভীতি, তাদের সশস্ত্র ও সদম্ভ চাহনিতে প্রকাশিত হয় ক্ষমতাদর্পীর তেজ ও পররাজ্যলোভীর ক্ষুধা।

প্রশ্ন : 'সাম্রাজ্যের দেশ-বেড়া জাল' চরণাংশটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : পররাজ্যলোভী ইংরেজ আগুনের উত্তাপ ছড়ানো রথে চড়ে দলে দলে প্রবেশ করেছে ভারতবর্ষে। দেশভ্রমণের উদ্দেশ্যে নয়, তারা এসেছে পররাজ্য শাসন করতে। অস্ত্রশক্তিতে তারা বলীয়ান। সমগ্র দেশকে আবৃত করে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জাল পেতেছে তারা। কিন্তু কাল ও সময়স্রোতে সবকিছু হারিয়ে যায়, কোনো চিহ্নই অবশিষ্ট থাকে না। কবির বিশ্বাস সমগ্র দেশকে আবেষ্টন করে ইংরেজরা যে জাল বিস্তার করেছে, কালস্রোতে তা ভেসে যাবে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১। কত কাল দলে দলে গেছে কত লোকে
সুদীর্ঘ অতীতে
জয়োদ্ধত প্রবল গতিতে

২। শূন্যপথে চাই,
আজ তার কোনো চিহ্ন নাই।

৩। জানি তারো পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল,
কোথায় ভাসায়ে দেবে সাম্রাজ্যের দেশ-বেড়া জাল।

৪। জানি তার পণ্যবাহী সেনা
জ্যোতিষ্কলোকের পথে রেখামাত্র চিহ্ন রাখিবে না।

কত কাল দলে দলে গেছে কত লোকে
সুদীর্ঘ অতীতে
জয়োদ্ধত প্রবল গতিতে

আলোচ্য কবিতাংশটুকু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ' আরোগ্য' কাব্যগ্রন্থের "ওরা কাজ করে" কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে সুদীর্ঘ অতীতে ভারতবর্ষের মাটিতে বিজয়গর্বে উদ্ধত সাম্রাজ্যলোভী বিভিন্ন জাতির অনুপ্রবেশের কথা ব্যক্ত করেছেন কবি।

মহাবিশ্বের প্রবহমান সময়স্রোতে কেউ স্থায়ী চিহ্ন রেখে যেতে পারে না। কবি মহাশুন্যের দিকে তাকিয়ে অলস সময়ধারা বেয়ে অতীত ইতিহাসের জগতে মানস পরিভ্রমণে বেরিয়েছেন। ইতিহাস চেতনায় উদ্দীপিত কবি মহাশূন্যের দিকে চেয়ে এ সত্যে উপনীত হয়েছেন যে, যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষে দলে দলে বিভিন্ন সাম্রাজ্যলোভী জাতির আগমন ঘটেছে। জয়ের গর্বে উদ্ধত ঐ সব জাতি মহাকালের বিশালতার তুলনায় সাময়িক স্থায়িত্বও লাভ করেছে। প্রতিষ্ঠা করেছে রাজবংশ, প্রয়াসী হয়েছে শোষণ ও শাসনের বিচিত্র কৌশল প্রয়োগ করে ক্ষমতার রূপকে চিরস্থায়ী করতে। কিন্তু কালস্রোতে সবই ভেসে যায়, মহাশূন্যের শূন্যতায় কোনো স্মরণচিহ্ন আঁকা থাকে না।

মহাকালের অনন্ত সময়স্রোতে সব কিছুই প্রবহমান। জয়ের গর্বে গর্বিত প্রতাপশালী তার বিজয়পতাকা চিরকালের জন্য উড্ডীন রাখতে পারে না।

জানি তার পণ্যবাহী সেনা
জ্যোতিষ্কলোকের পথে রেখামাত্র চিহ্ন রাখিবে না।

উদ্ধৃত চরণদুটি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আরোগ্য' কাব্যের "ওরা কাজ করে" কবিতার অন্তর্গত। এখানে কবি ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যেবিস্তারী শক্তিরূপে ক্ষমতার নেশায় মত্ত ইংরেজদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিজের প্রত্যয়ের কথা ব্যক্ত করেছেন।

মানবতাবাদী কবি রবীন্দ্রনাথ মানুষের ভেতরকার সম্ভাবনাকে অনেক বড় করে দেখেছেন। 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ' – তাঁর রচিত এ প্রত্যয়বাণীতে কবির মানুষের প্রতি বিশ্বাসের কথা মূর্ত হয়ে আছে। কিন্তু জীবনের অন্তিম পর্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সুসভ্য ইংরেজ রাজশক্তির ভয়ংকর মানববিধ্বংসী মূর্তিতে আশ্রকাশে বিচলিত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর আশৈশব লালিত বিশ্বাসে চিড় ধরে। ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত এ ঔপনিবেশিক শক্তির সাম্রাজ্যবাদী আচরণ বিক্ষুব্ধ করে তোলে রবীন্দ্রনাথকে। ইতিহাসের জগতে মানস পরিভ্রমণ করে রবীন্দ্রনাথ এ সত্যজ্ঞান লাভ করেন যে ক্ষমতাগর্বী কোনো জাতিই চিরস্থায়ী অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজ করে না। সমগ্র দেশ জুড়ে শাসন ও শোষণের জাল বিস্তার করেও ইংরেজকে এ-দেশ থেকে হটতে হবে। মহাবিশ্বের সময়ধারায় বহু ক্ষমতাগর্বী শাসকগোষ্ঠী আসা-যাওয়া করেছে, কিন্তু কেউই স্থায়ী চিহ্ন রেখে যেতে পারেনি। ক্ষমতালোভী ইংরেজরাও জ্যোতির্মণ্ডলের পথে কোন রেখা-চিহ্ন রেখে যাবে না।

কালস্রোতে সবকিছুই ভেসে যায়। বলদর্পী যতই প্রবল হোক, জ্যোতিষ্কলোকের পথে তার চিহ্নমাত্র আঁকা থাকবে না।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- মাটির পৃথিবীতে শ্রমজীবী মানুষের কর্মধারার পরিচয় দিতে পারবেন।
- সাম্রাজ্যলোভী অতীত রাজবংশসমূহের মূল্যহীন স্মারক চিহ্নগুলির অবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কবির অনুভূতির আলোকে শ্রমজীবী মানুষের শাশ্বত জীবনধারার মূল্যায়ন করতে পারবেন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
মাটির পৃথিবী পানে আঁখি মেলি যবে – জ্যোতিষ্কলোক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে কবি বর্তমানের ধূলি মাটি মাখা	মাটির পৃথিবীর-পানে আঁখি মেলি যবে দেখি সেখা কলকলরবে বিপুল জনতা চলে

পৃথিবীতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন।

জলকলরব – জলপ্রবাহ জনিত মৃদু মধুর ধ্বনি। এখানে জলপ্রবাহের জনতার চলমানতাকে এক করে দেখানো হয়েছে।

যুগযুগান্তর – এক যুগ থেকে অন্য যুগে।

জীবনে মরণে – এখানে জীবন ও মৃত্যু সত্ত্বেও জীবনের অনিঃশেষ চলমানতাকে বোঝানো হয়েছে।

দাঁড় – এক ধরনের বৈঠা।

হাল – নৌকা চালাবার বা ঘোরাবার কাঠের তৈরি যন্ত্র।

নগরে – শহরে, এখানে শহরের কারখানা অর্থেও প্রযোজ্য।

প্রান্তরে – ভূমি, মাঠ, এখানে বিশেষভাবে কৃষিক্ষেত্র অর্থে।

রাজছত্র – পূর্বকালে রাজার মাথার ওপর যে ছাতা ধরা হতো। যে ছাতা রাজার মর্যাদার স্মারক।

রণডঙ্কা – যুদ্ধের জয়ঢাক। যুদ্ধের দুন্দুভি।

জয়স্তম্ভ – বিজয় লাভের চিহ্নস্বরূপ নির্মিত স্তম্ভ বা থাম।

মূঢ়সম – নির্বোধের মতো।

শিশুপাঠ্য কাহিনী – কেবল শিশুদের জন্য পাঠ্য গল্প বা কাহিনী। এখানে শেষার্থে প্রযুক্ত।

দেশে দেশান্তরে – এক দেশ থেকে অন্য দেশে।

অঙ্গ – গঙ্গাতীরবর্তী প্রাচীন ভারতীয় দেশ।

বঙ্গ – প্রাচীন ভারতের উত্তর পূর্বস্থ একটি জনপদের নাম। বাংলাদেশের প্রাচীন নাম।

কলিঙ্গ – উড়িষ্যা ও তার দক্ষিণে দ্রাবিড় অঞ্চল সমেত প্রাচীন ভারতের প্রদেশবিশেষ।

পঞ্জাব – উত্তর পশ্চিম ভারতের প্রদেশ বা রাজ্য বিশেষ।

বোম্বাই – ভারতের অন্যতম রাজ্য বা ঐ রাজ্যের প্রধান নগর।

নানা পথে নানা দলে দলে
যুগ যুগান্তর হতে মানুষের নিত্য প্রয়োজনে
জীবনে মরণে।
ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল,
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।
রাজছত্র ভেঙে পড়ে, রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে,
জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার,
রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত-আঁখি
শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি।

ওরা কাজ করে
দেশে দেশান্তরে,
অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের সমুদ্রে নদীর মাঠে ঘাটে,
পঞ্জাবে বোম্বাই-গুজরাটে
গুরুগুরু গর্জন গুন্‌গুন্‌ স্বর
দিনরাত্রে গাথা পড়ি দিনযাত্রা করিছে মুখর।
দুঃখ সুখ দিবসরজনী
মন্দ্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ধ্বনি
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ-পরে
ওরা কাজ করে।

গুজরাট – প্রাচীন ভারতের গুর্জর রাষ্ট্র; বোম্বাই রাজ্যের কাছে এবং সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত দেশবিশেষ। **গুরু গুরু (অব্যয়)** – মৃদুগম্ভীর মেঘগর্জন ধ্বনি। **গুন্‌গুন্ (অব্যয়)** – মৃদু মধুর ধ্বনি। **মন্দ্রিত** – গম্ভীর শব্দে ধ্বনিত। জীবনের মহামন্ধ্বনি – অনিঃশেষ জীবন ধারার জয়ধ্বনি অর্থে প্রযুক্ত।	

ভাবসংক্ষেপ

জ্যোতির্মণ্ডল থেকে চোখ সরিয়ে কবি এবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন ধূলিমাটি মাখা পৃথিবীতে। তাঁর চোখে পড়ে নদীর জলস্রোতের মতো যুগ যুগান্তর ধরে চলমান জনতার স্রোত। জীবনের প্রয়োজনে জন্ম-মৃত্যুর নিয়ম মেনে নিয়েই এ মানবজীবন-স্রোত চিরকাল ধরে প্রবহমান। সাধারণ শ্রমজীবী এ মানুষের চিরকাল ধরে দাঁড় টানে, হাল ধরে থাকে। ওরা কঠিন পরিশ্রমে জমি কর্ষণ করে বীজ বোনে, পাকা ফসল কাটে। শহরের কারখানায় আর গ্রামের বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রে ওরা কাজ করে। ভূষণ হিসেবে রাজার মাথায় ছায়া বিস্তার করে থাকে যে ছাতা, মর্যাদার স্মারক সেই 'রাজছত্র' ভেঙে পড়ে, স্তব্ধ হয়ে যায় যুদ্ধের জয়ঢাক, বিজয়ের স্মারকস্তম্ভ নিজের অর্থ হারিয়ে নির্বোধের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। রাজবংশের বলদর্পী সশস্ত্র রাজাদের ভীতিসঞ্চারী আরক্ত চোখ শিশুপাঠ্য কাহিনীতে আত্মাপন করে থাকে। তাদের বিজয়গাথা রূপকথার মতোই শিশুদের মনোরঞ্জনের খোরাক যোগায় মাত্র। কিন্তু এর বিপরীতে কর্মমুখর জনতার স্রোত যুগ যুগ ধরে জীবন্ত হয়ে আছে। মধুর ও গম্ভীর ধ্বনিতে মুখরিত জনতার এ অবিশ্রাম স্রোতোধারা মানুষের অগ্রযাত্রার, তাদের বেঁচে থাকার মহামন্ত্রকে মন্ত্রিত করে তোলে। শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নাবশেষের উপরে শাশ্বত শ্রমজীবী মানুষের জীবনধারা অটুট থাকে। মরণকে জয় করে ওরা, শ্রমজীবী মানুষেরা কাজ করে নগরে প্রান্তরে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. মাটির পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে কবি কী দেখেন?
২. বলদর্পী রাজাদের বিজয় কাহিনীর কী পরিণতি হয়েছে?
৩. 'জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার ভোলে' - কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।
৪. অতীত রাজবংশসমূহের বিজয়ের স্মরণ চিহ্নগুলির বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করুন।
৫. শ্রমজীবী মানুষ যুগ যুগ ধরে কীভাবে বেঁচে থাকে?

প্রশ্ন : বলদর্পী রাজাদের বিজয় কাহিনীর কী পরিণতি হয়েছে?

উত্তর : বিভিন্ন যুগে বলদর্পী রাজবংশগুলি ভারতবর্ষে তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে। কিছু বস্তুগত কীর্তি স্থাপন করে অনাগত ভবিষ্যতেও যাতে তাদের বিজয়গাথা মানুষ স্মরণ রাখে তার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে তারা। কিন্তু তারা জানতো না সময়স্রোতে পররাজ্যলোভীর প্রতাপ হারিয়ে যায়। শাশ্বত মানবাত্মপ্রচণ্ড ঘৃণাভরে তাদের প্রত্যাখ্যান করে। কবি এ মনোভাবকেই তিনটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর ভাষায় সময়স্রোতে রাজার মর্যাদা ও প্রতাপের চিহ্ন যে 'রাজছত্র' তা ভেঙে পড়ে, যুদ্ধের বিজয় দুন্দুভি স্তব্ধ হয়ে যায়, বিজয়কে চিরস্থায়ী করে তোলার মানসে তৈরি করা হয় যে 'জয়স্তম্ভ' তা নিজের অর্থ হারিয়ে নির্বোধের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের দর্পের প্রতাপের ও

অত্যাচারের লোমহর্ষক কাহিনী, তাদের সশস্ত্র রক্তচক্ষু রূপ আস্ফালন করে থাকে শিশুপাঠ্য বইয়ে। তাদের বিজয়গাথা রূপকথার মতো শিশুদের মনোরঞ্জনের বিষয় হয়ে থাকে মাত্র।

প্রশ্ন : 'জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার ভোলে' - কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : বিজয়গর্বে গর্বিত মানুষ মনে করে তার কীর্তি বুঝি চিরস্থায়ী হবে। বলদর্পী ও পররাজ্যলোভী রাজবংশের রাজারা এ-ধারণা থেকেই ভবিষ্যতের মানুষের কাছে তাদের প্রতাপ ও বিজয়ের গাথা পৌঁছে দেয়ার বাসনায় প্রতিষ্ঠা করে জয়স্তম্ভ। রাজহুমকির প্রতীক হয়ে যুগ-যুগান্তর ধরে তাদের বল প্রতাপ ও ঐশ্বর্যের কথা 'জয়স্তম্ভ' ঘোষণা করবে প্রতিনিয়ত, এ বিশ্বাস তাদের। কিন্তু তারা জানতো না যে, সময়স্রোতে অনেককিছুই ভেসে যায়। অক্ষুণ্ন থাকে যে শ্রমজীবনধারা সে ধারার মানুষ অত্যাচারের কাহিনীকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। উত্তরকালে তাই বলদর্পীর বিজয়স্তম্ভ অর্থ বা মহিমা হারিয়ে নির্বোধের মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১। ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল।
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।

২। রক্তমাথা অস্ত্র হাতে যত রক্ত আঁখি
শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি।

৩। ওরা কাজ করে
দেশে দেশান্তরে,
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সমুদ্রনদীর ঘাটে ঘাটে,
পাঞ্জাবেবোম্বাই-গুজরাটে।

৪। গুর গুরু গর্জন গুন্ গুন্ স্বর
দিনরাত্রে গাঁথা পড়ি দিনযাত্রা করিছে মুখর।
দুঃখসুখ দিবসরজনী
মন্দ্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ধ্বনি।

৫। শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ-'পরে
ওরা কাজ করে।

নমুনা উত্তর

গুর গুরু গর্জন গুন্ গুন্ স্বর
দিনরাত্রে গাঁথা পড়ি দিনযাত্রা করিছে মুখর।
দুঃখসুখ দিবসরজনী
মন্দ্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ধ্বনি।

উদ্ধৃত স্তবকটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আরোগ্য' কাব্যগ্রন্থের "ওরা কাজ করে" কবিতা থেকে সংগৃহীত। আলোচ্য অংশে কবি মাটির পৃথিবীতে যুগ যুগ ধরে শ্রমজীবী জনতার স্রোতধারার মধ্যে মানবজীবনের 'মহামন্ধ্বনি' শুনতে পেয়েছেন।

জ্যোতির্লোকে কোনো স্মরণচিহ্ন রেখে যেতে পারেনি বলদর্পী রাজবংশগুলো। মাটির পৃথিবীতে যে সব জয়স্তম্ভ' প্রতিষ্ঠা করেছিলো তারা, সেগুলিও আজ নিজের অর্থ বিস্মৃত হয়ে নির্বোধের মতো দাঁড়িয়ে আছে। পক্ষান্তরে ধূলিমাটি মাখা পৃথিবীতে আবহমান কাল ধরে নিরন্তর প্রবাহিত হয়ে চলেছে শ্রমজীবী জনতার কোলাহলময় স্রোত। কর্মমুখর চলায়

শোনা যায় গম্ভীর মধুর গর্জন ও স্বর। তাদের চলার শব্দের এ গাম্ভীর্য ও মাধুর্য একসূত্রে আবদ্ধ হয়ে দিনরাত্রির পরিক্রমাকে করে তুলেছে মুখরিত। দুঃখ ও সুখ মিশ্রিত দিবারাত্রির এ পরিক্রমায় ধ্বনিত বা মন্দ্রিত হয়ে উঠছে 'জীবনের মহামন্ধ্বনি'। মাটির পৃথিবীতে ব্যক্তি মানুষের মৃত্যু ঘটে কিন্তু জীবনধারা বা জীবনের বিস্তার কখনো স্তব্ধ হয় না- এ 'মহামন্ধ্বনি শ্রমজীবী জনতার চলমানতায় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়।
মাটির পৃথিবীতে শ্রমজীবী জনতার সচল যে স্রোত, তাতে ধ্বনিত হয় মানবাত্মার শাশ্বত অস্তিত্বের মহামন্।

শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ-'পরে
ওরা কাজ করে।

আলোচ্য চরণদুটি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আরোগ্য' কাব্যগ্রন্থের "ওরা কাজ করে" কবিতার অন্তর্গত। যুগ যুগ ধরে শত শত সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ-এর উপরে শাশ্বত অস্তিত্ব নিয়ে শ্রমজীবী মানুষ যে চির বর্তমান, কবির এ মনোভাবই আলোচ্য কবিতাংশে ব্যক্ত হয়েছে।
যুগে যুগে ভারতবর্ষের মাটিতে পররাজ্যলোভীরা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু বলদর্পী ঐ সব রাজবংশ কালের বুকে স্থায়ী কোনো স্মরণ চিহ্ন রেখে যেতে পারেনি। সময়ের স্রোতধারায় ভারতবর্ষের মাটিতে উপনিবেশ স্থাপন করেছে সাতসমুদ্র তেরো নদী পাড়ি দিয়ে আসা ইংরেজ, স্মরণীয় ইতিহাস চেতনাই কবিকে এ শিক্ষা দিয়েছে যে, সারা দেশে সাম্রাজ্যের জাল বিস্তার করে দাঁড়ানো প্রতাপশালী ইংরাজরাও ভেসে যাবে অকালস্রোতে। তিনি নিশ্চিতভাবে জানেন যে, সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়, লুপ্ত হয়ে যায় সম্রাটের স্মৃতিচিহ্নও। কালকে জয় করতে পারে কেবল শ্রমজীবী মানুষের অনিঃশেষ স্রোতধারা কবি তাঁর ইতিহাস অভিজ্ঞতা থেকে এ সত্যে উন্নীত হয়েছেন যে, শত শত সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ এর উপরে বেঁচে আছে চিরকালীন শ্রমজীবী মানুষ; যারা দাঁড়টানে, হাল ধরে, বীজ বোনে, ফসল ফলায়। নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালবাচক পদ ব্যবহার করে তাদের এ চিরায়ত অস্তিত্বকেই মূর্ত করে কবি লিখেছেন "ওরা কাজ করে"।
বলদর্পী সাম্রাজ্যলোভীর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যসমূহ ধ্বংস হয়ে যায়, কিন্তু শ্রমজীবী মানুষ ঐ ধ্বংসাবশেষ-এর উপরে দাঁড়িয়েই নিজের কর্মমুখর চিরায়ত অস্তিত্ব ঘোষণা করে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

নিচের রচনামূলক প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য-উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে, সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে সব প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়নি, সেগুলো নিজে লিখুন।

১. 'ওরা কাজ করে' কবিতার মূলভাব বিশ্লেষণ করুন।
২. 'ওরা কাজ করে' কবিতা অবলম্বনে কবির ইতিহাস চেতনা ব্যাখ্যা করুন।
৩. মানব অস্তিত্ব এবং মানুষের মধ্যকার সম্ভাবনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিন।
৪. ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজশক্তির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির মূল্যায়ন করুন।

রচনামূলক প্রশ্নের নমুনা উত্তর

প্রশ্ন : 'ওরা কাজ করে' কবিতা অবলম্বনে কবির ইতিহাস চেতনা ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বকীয় ইতিহাস চেতনা "ওরা কাজ করে" কবিতার এক বিশিষ্ট প্রসঙ্গ। জীবনের অন্তিম পর্যায়ে, বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজশক্তির হিংস্র মূর্তিতে পুনরুত্থানে শঙ্কিত হয়ে পড়েন মানবতাবাদী কবি রবীন্দ্রনাথ। মানুষের প্রতি অগাধ আস্থা যাঁর সাহিত্যসাধনার মূল প্রেরণা, সেই কবি ব্রিটিশ রাজশক্তির সাম্প্রতিক মানবতাবিরোধী আচরণে ক্ষুব্ধ হন। মানুষের প্রতি তার অগাধ বিশ্বাসের ভিত্তিতে চিড় ধরে। কিন্তু ইতিহাস চেতনাই কবিকে পুনরায় ফিরিয়ে আনে তাঁর বিশ্বাসের জগতে।

কবি ইতিহাস অধ্যয়ন করে জেনেছেন যে, যুগে যুগে দেশে-দেশে পররাজ্য লোভীরা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু কোনো সাম্রাজ্যই চিরস্থায়ী রূপ লাভ করেনি। বিশাল মহাবিশ্বের বক্ষে প্রবহমান সময়স্রোতে সুকঠিন সাম্রাজ্য ও সাম্রাজ্যশক্তি ভেসে গেছে। কবির এ অধীত জ্ঞানই তাঁকে এ বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত করেছে যে, বলদর্পী ইংরেজদের

ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত শাসন শৃঙ্খলও টুটে যাবে। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর 'রবীন্দ্র-কাব্য পরিক্রমা' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করে লিখেছেন যে, "কবি ঐতিহাসিক ও দার্শনিক দৃষ্টি দিয়া ভারতের অতীত ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহকে লক্ষ্য করিয়াছেন। অতীতে কত রাজা ভারতে রাজত্ব করিতে আসিয়াছে, আসিয়াছে পাঠান, আসিয়াছে মোগল, তারপর ইংরেজ আসিয়া তাহার শক্তির তীব্র আলোকে সকলের চোখ বাঁধিয়া দিতেছে। কবি জানেন, পূর্বের বিজয়ী রাজা-বাদশাদের সাম্রাজ্যের মত তাহাদের বিশাল সাম্রাজ্যও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, লোকের দৈনন্দিন জীবনে তাহাদের স্মৃতির অস্তিত্ব থাকিবে না। কালের নির্মম হাত হইতে কোন শক্তিমদমও সাম্রাজ্যলোভীর নিস্তার নাই – এক যুগের বহুজন শোষিত ঐশ্বর্য পরবর্তী যুগে ধ্বংস হইয়া যায়।" কবির এ বিশ্বাসকে দৃঢ়তা দিয়েছে ধূলিমাটিমাখা পৃথিবীর অভিজ্ঞতা। তিনি লক্ষ করেছেন সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ, তারা নগরে ও গ্রামে, মাঠে ও প্রান্তরে কায়িক শ্রমের বিনিময়ে জীবীকা নির্বাহ করছে, তারা চিরকাল ধরেই একইভাবে মানবজীবনধারাকে সচল রেখেছে। কবির ভাষায়

মাটির পৃথিবীপানে আঁখি মেলি যবে
দেখি সেখা কলকলরবে
বিপুল জনতা চলে
নানা পথে নানা দলে দলে
যুগযুগান্তর হতে মানুষের নিত্য প্রয়োজনে
জীবনে মরণে।
ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল।
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে
ওরা কাজ করে নগরে প্রান্তরে।

মাটির পৃথিবীর এ তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের সচল জীবন প্রত্যক্ষ করেই কবির ইতিহাসচেতনা পূর্ণ রূপ লাভ করেছে। কবি লক্ষ করেছেন বলদর্পী সাম্রাজ্যলোভীর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য ভেসে গেছে, ভেঙে পড়েছে রাজার প্রতাপের প্রতীক 'রাজছত্র' যুদ্ধের দুন্দুভি রাজার প্রতাপকে ধ্বনিত করে আর শঙ্কিত করে তোলে না সাধারণ মানুষকে। অথচ এরই বিপরীতে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ স্বীয় অস্তিত্ব নিয়ে যুগযুগ ধরে বর্তমান। রবীন্দ্রনাথের সহজ মানবপ্রীতিই তাঁকে করেছে আন্তরিক ও সংবেদনশীল। তিনি জনতার অবিশ্রাম স্রোতোধারায় তাই শুনতে পেয়েছেন শ্রমজীবী মানুষের জীবনের মৃদু-গম্ভীর 'মহামন্ধ্বনি'।
শত শত সাম্রাজ্যের 'ভগ্নশেষ'-এর উপরে বেঁচে আছে শ্রমজীবী মানুষের জীবনের ঐ মহামন্ধ্বনি। কবির মানবপ্রীতি জাত এ ইতিহাস চেতনাই "ওরা কাজ করে" কবিতার ভাবজগৎ প্রতিষ্ঠা করেছে।

প্রশ্ন : ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজশক্তির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির মূল্যায়ন করুন।

উত্তর : "আরোগ্য' কাব্যগ্রন্থের "ওরা কাজ করে" কবিতায় জীবনের অন্তিম পর্বে অর্থাৎ ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের মানবতাবিরোধী সংঘাতে বিচলিত কবির দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বিধৃত। বিশেষত ভারতবর্ষের মাটিতে উপনিবেশের জাল বিস্তার করে প্রবল প্রতাপ নিয়ে অবস্থান করছে যে ইংরেজরা, তাদের সাম্রাজ্যবাদী আচরণ কবি চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। " ওরা কাজ করে" কবিতায় ভারতবর্ষে বলদর্পী ইংরেজদের অনুপ্রবেশ পর্বকে এভাবে চিত্রময় করে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ :

আরবার সেই শূন্যতলে
আসিয়াছে দলে দলে
লৌহবাঁধা পথে
অনলনিশ্বাসী রথে
প্রবল ইংরেজ,
বিকীর্ণ করেছে তার তেজ।

'ওরা কাজ করে' কবিতা রচনার প্রায় সমসময়ে রচিত 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের সাম্প্রতিক সাম্রাজ্যবাদী রূপ প্রত্যক্ষ করে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। আশি বছরের দীর্ঘ জীবন পরিক্রমায় রবীন্দ্রনাথের মনে সুসভ্য ইংরেজদের জন্য সঞ্চিত ছিলো শ্রদ্ধা ও সম্মান। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে তাদের মানবতাধ্বংসী আচরণ তাঁর শ্রদ্ধা ও সম্মানের স্থানটিতে ফাটল ধরায়। প্রথম জীবনে তাঁর ধারণা ছিলো এ বিজয়ী জাতির দাক্ষিণ্যেই বিজিত ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হবে। কিন্তু 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ" এ প্রত্যয় কবিকে হতাশার অন্ধকারে নিক্ষেপ করে না। আশাবাদী কবি মানবীয় বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন। "ওরা কাজ করে" কবিতায় কবি রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসচেতনাজাত ঐ আশাবাদী প্রত্যয়ই মূর্ত হয়েছে। কবি লিখেছেন–

'জানি তারো পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল,
কোথায় ভাসায়ে দেভে সামাজ্যের দেশ-বেড়া জাল।
জানি তার পণ্যবাহী সেনা
জ্যোতিষ্কলোকের পথে রেখামাত্র চিহ্ন রাখিবে না।'

রবীন্দ্রনাথ "মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে" 'অপরাধ' বলে মনে করেন বলেই দৃঢ়বিশ্বাসে বলতে পেয়েছেন, যে, "ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এ ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে।" কবির এ দৃঢ়প্রত্যয়ই কাব্যরূপ পেয়েছে 'ওরা কাজ করে' কবিতায়। কবি বলেছেন অনন্ত মহাবিশ্বের প্রবহমান স্রোতে ভেসে যাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 'দেশ বেড়া জাল'। অন্যান্য পররাজ্যলোভী' শক্তি যেমন চলমান সময়স্রোতে কোনো চিহ্ন রেখে যেতে পারেনি, তেমনি ইংরেজদের প্রতাপের চিহ্নও 'জ্যোতিষ্কলোকের পথে' আঁকা থাকবেনা। বেঁচে থাকবে কেবল শাশ্বত মানবজীবন ধারা – শ্রমজীবী মানুসের প্রাণ-কোলাহলে যুগ যুগ ধরে এ জীবনধারা চিরবর্তমান। কারণ শত শত সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের ওপর সচল রয়েছে কেবল শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের জীবনপ্রবাহ যারা নগরে প্রান্তরে, দেশে দেশান্তরে, শত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও কাজ করে।

ভাষা বিষয়ক প্রশ্ন

সর্বনাম পদ : বিশেষ্য অথবা বিশেষ্যস্থানীয় খণ্ডবাক্য কিংবা বাক্যাংশের পরিবর্তে বসানো চলে, এমন পদকে বলা হয় **সর্বনাম** বা প্রতিনাম। বাংলা সর্বনামের মধ্যে কিছু সর্বনাম কেবল প্রাণীবাচক শব্দের পরিবর্তেই বসে। তাদের প্রাণীবাচক সর্বনাম বলা হয়। যেমন : **ওরা কাজ করে** বাক্যের "ওরা" প্রাণীবাচক সর্বনাম পদ। বর্তমান কবিতায় "ওরা" এ সর্বনাম সহায় নির্দেশের ভঙ্গিতে নির্মম শ্রেণী পার্থক্য ব্যঞ্জিত করা হয়েছে।

নিত্যবৃত্ত বর্তমানকাল : নিয়মিত অথবা সাধারণত ঘটে, ক্রিয়ার এ-অবস্থা বোঝানোর জন্য কালের যে রূপ ব্যবহৃত হয় তাকে বলা হয় **নিত্যবৃত্ত বর্তমান** বা **সাধারণ বর্তমানকাল**। দৃষ্টান্ত **ওরা কাজ করে**। এখানে শ্রমজীবীদের নিয়মিত কাজ করা কেবল বর্তমানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ মিলিয়ে কর্মের সঙ্গে তাদের নিত্য সংযোগের অর্থদ্যোতনা সৃষ্টি হয়েছে।

সমাস : একাধিক শব্দ একসঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি বড় শব্দ তৈরির প্রসঙ্গকে বলা হয় সমাস। সমাসের শ্রেণীবিভাগ রযেছে। আলোচ্য "ওরা কাজ করে" কবিতায় রয়েছে সমাসবদ্ধপদের প্রাচুর্য। নিম্নে ব্যাসবাক্য এবং সমাসের নামসহ কবিতাটিতে ব্যবহৃত কিছু সমাসবদ্ধ পদ উল্লেখ করা হলো :

সময়ধারা	–	সময়ের ধারা	–	ষষ্ঠ তৎপুরুষ সমাস
ছায়া আঁকা	–	ছায়া দ্বারা আঁকা	–	তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস
লৌহবাঁধা	–	লৌহ দ্বারা বাঁধা	–	তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস
অনলনিশ্বাসী	–	অনল নিশ্বাস ছাড়ে যে	–	কর্মধারয় সমাস
রক্ত আঁখি	–	রক্ত রঞ্জিত আঁখি	–	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস।

সন্ধি : দ্রুত উচ্চারণের ফলে পাশাপাশি থাকা দুটি ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে। এতে দুটি ধ্বনির মিলন, পরিবর্তন বা লোপ হতে পারে। 'এরূপ মিলন বা লোপ বা পরিবর্তনকে **সন্ধি** বলে'। যেমন আলোচ্য কবিতার 'জয়োদ্ধত' শব্দটি সন্ধির দৃষ্টান্ত – জয়+উদ্ধত = জয়োদ্ধত।

বিপরীতার্থক শব্দ : 'একটি শব্দ যে ভাব বা অর্থ প্রকাশ করে, অন্য একটি শব্দ, তার বিপরীত ভাব বা অর্থবোধক হলে, শব্দ দুটিকে পরস্পরের **বিপরীতার্থক শব্দ** বা **বিপরীত শব্দ** বলা হয়'। "ওরা কাজ করে" কবিতা থেকে কিছু শব্দ সংকলন করে এর উদাহরণ উপস্থাপন করা হলো :

শব্দ	**বিপরীতার্থক শব্দ**
অলস –	কর্মঠ
নির্মল –	সমল
বিকীর্ণ –	সংকীর্ণ
মূঢ় –	বুদ্ধিমান
মুখর –	নিথর

বিরাম চিহ্ন : লিখিত বাক্যে বিরাম বা ছেদ নির্দেশ করা যে-সব চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাদের সাধারণ নাম **বিরাম চিহ্ন বা ছেদ চিহ্ন।** "ওরা কাজ করে" কবিতা থেকে দু'ধরনের বিরাম চিহ্ন ব্যাখ্যা করা হল।

ক) সূর্যোদয় – সূর্যাস্তের

'সূর্যোদয়' ও 'সূর্যাস্তের' মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র সংযোগ রেখাটির নাম **হাইফেন।** হাইফেন ছেদচিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। দুটি পদের মধ্যে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করে বলে একে সংযোগ চিহ্নও বলা হয়।

খ) 'এসেছে মোগল'–
বিজয়রথের চাকা
উড়ায়েছে ধূলিজাল, উড়িয়াছে বিজয়পতাকা

'এসেছে মোগল'-এর পর অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ রেখাচিহ্নটির (–) নাম ড্যাশ। এটি বাক্যান্তর্গত ছেদচিহ্ন। 'বক্তব্যকে ব্যাঘাত করা, উদাহরণের আগে, বক্তার সঙ্গে বক্তব্যকে যোগ করা প্রভৃতি বহুরকম ব্যবহার আছে এ চিহ্নের। উল্লিখিত তিনটি চরণে উদ্দেশ্যের সঙ্গে বিধেয়-র যোগ স্থাপনের কাজ রেখেছে 'ড্যাশ' চিহ্নটি।

সৃজনশীল কাজের পরামর্শ

- "ওরা কাজ করে" কবিতায় ব্যবহৃত সমাসবদ্ধ পদগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।
- কবিতা থেকে পাঁচটি শব্দ বাছাই করে প্রতিটি শব্দের তিনটি করে সমার্থ শব্দ উপস্থাপন করুন।
- 'ওরা মাঠে মাঠে
  বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।'
  এ চরণদুটির ক্রিয়াপদের 'কাল' নির্ণয় করুন।
- 'কৃষকের ধান কাটা' বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করুন।

আরও যা পড়তে পারেন

রবীন্দ্রনাথের কাব্যসমূহ।